বাংলা ভাষাচর্চা

বাংলা ব্যাকরণ। ষষ্ঠ শ্রেণি

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৪
দ্বিতীয় প্রকাশ: ডিসেম্বর, ২০১৫
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ : মার্চ, ২০১৭

গ্রন্থস্বত্ব : পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রকাশক
অধ্যাপিকা নবনীতা চ্যাটার্জি
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
ওয়েস্ট বেঙ্গল টেক্সটবুক কর্পোরেশন
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)
কলকাতা-৭০০ ০৫৬

পর্ষদ-এর কথা

ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নতুন পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচি অনুযায়ী বাংলা ব্যাকরণের বই 'বাংলা ভাষাচর্চা' প্রকাশ করা হলো। এই 'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। ব্যাকরণ অংশ যেমন ছাত্রছাত্রীদের ভাষাজ্ঞানকে নির্ভুল ও যথাযথ করবে, তেমনি নির্মিতি অংশ সাহায্য করবে তাদের সৃজনশীল লেখালিখির ক্ষেত্রে।

ছাত্রছাত্রীদের প্রেরণা জোগাতে এবং ব্যাকরণের মতো তথাকথিত নীরস বিষয়কে সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে বিভিন্ন শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দের নিরলস প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের সমস্ত বিষয়ের বই ছাপিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বিনামূল্যে বিতরণ করে থাকে। এই প্রকল্প রূপায়ণে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ড. পার্থ চ্যাটার্জী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষাদপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষা অধিকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন নানাভাবে সহায়তা করেন এবং এঁদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য সকলকে মতামত ও পরামর্শ জানাতে আহ্বান করছি।

মার্চ, ২০১৭
৭৭/২ পার্ক স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০১৬

কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়
প্রশাসক
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

প্রাক্‌কথন

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২০১১ সালে বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি 'বিশেষজ্ঞ কমিটি' গঠন করেন। এই 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-র ওপর দায়িত্ব ছিল বিদ্যালয়স্তরের সমস্ত পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক - এর পর্যালোচনা,পুনর্বিবেচনা এবং পুনর্বিন্যাসের প্রক্রিয়া পরিচালনা করা। সেই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী নতুন পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তক রচিত হলো। আমরা এই প্রক্রিয়া শুরু করার সময় থেকেই জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ (NCF 2005) এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ (RTE 2009) এই নথি দুটিকে অনুসরণ করেছি।

ষষ্ঠ শ্রেণির 'বাংলা ভাষাচর্চা' পুস্তকটি ব্যাকরণ এবং নির্মিতি অংশ নিয়ে গঠিত। চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণির 'বাংলা ভাষাপাঠ' বইগুলির সম্প্রসারণ উচ্চ-প্রাথমিকের এই বই। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের সম্পূরক এই পুস্তকে ব্যাকরণের ধারণা এবং বিবিধ প্রয়োগকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব ও পদ্ধতির উপর নির্ভর করে আমরা ব্যাকরণচর্চার অভিমুখের পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করেছি। ষষ্ঠ শ্রেণির 'বাংলা ভাষাচর্চা' বইটির ব্যাকরণ অংশ লিখেছেন অধ্যাপক রাজীব চৌধুরী। এই সহায়তার জন্য তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

নির্বাচিত শিক্ষাবিদ, শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিষয়-বিশেষজ্ঞবৃন্দ অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রস্তুত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যশিক্ষার সারস্বত নিয়ামক মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। তাঁদের নির্দিষ্ট কমিটি বইটি অনুমোদন করে আমাদের বাধিত করেছেন। বিভিন্ন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সর্বশিক্ষা মিশন,পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা অধিকার প্রভূত সহায়তা প্রদান করেছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

বইটির উৎকর্ষ বৃদ্ধির জন্য শিক্ষাপ্রেমী মানুষের মতামত, পরামর্শ আমরা সাদরে গ্রহণ করব।

চেয়ারম্যান
'বিশেষজ্ঞ কমিটি'
বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মার্চ, ২০১৭
নিবেদিতা ভবন, পঞ্চম তল
বিধাননগর, কলকাতা ৭০০ ০৯১

বিশেষজ্ঞ কমিটি পরিচালিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন পর্ষদ

সদস্য

অভীক মজুমদার (চেয়ারম্যান, বিশেষজ্ঞ কমিটি) রথীন্দ্রনাথ দে (সদস্য-সচিব, বিশেষজ্ঞ কমিটি)

নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী

ঋত্বিক মল্লিক সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায় রুদ্রশেখর সাহা মিথুন নারায়ণ বসু

ইলোরা ঘোষ মির্জা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ

অলয় ঘোষাল

পুস্তক নির্মাণ

বিপ্লব মণ্ডল

সূচিপত্র

ব্যাকরণ অংশ

১. বিসর্গসন্ধি ১

২. শব্দের গঠন ২৩

৩. শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ও উপসর্গ ৬৮

৪. ধাতুরূপ। ধাতুবিভক্তি / ক্রিয়ারভক্তি ও ক্রিয়া ১১৬

৫. শব্দযোগে বাক্যগঠন ১৪১

নির্মিতি অংশ

১. সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ ১৯৯

২. পদান্তর ২১২

৩. পত্ররচনা ২২৫

৪. অনুচ্ছেদ রচনা ২৪০

৫. বোধ পরীক্ষণ ২৬০

৬. দিনলিপি ৩০১

প্রথম অধ্যায়

বিসর্গসন্ধি

পাশাপাশি বসতে পারে এমন দুটি শব্দ কখনো কখনো পরস্পরের সঙ্গে সন্ধি করে এটা তোমরা শিখে গেছ। অনেকটা দুটো ছোটো বরফের টুকরো জোড়া লেগে একটা বড়ো বরফের টুকরো হবার মতো — তাই তো? সেভাবেই দুটো শব্দের মধ্যে প্রথম শব্দটার শেষ ধ্বনি আর পরের শব্দটার প্রথম ধ্বনি আসলে পরস্পরের মধ্যে সন্ধিটা করে। তাদের মধ্যে অনেকরকমভাবে সন্ধি হয়, এটাও তোমরা দেখেছ। ধরো, **দুটো ধ্বনিই**

জুড়বার পরে বদলে গিয়ে একটা নতুন ধ্বনি হয়ে যায়। যেমন :

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট

(য্ + অ + থ্ + আ) + (ই + ষ্ + ট্ + অ)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮

= য্ + অ + থ্ + এ + ষ্ + ট্ + অ

১ ২ ৩ (✶)৬ ৭ ৮

আ + ই = এ

তাহলে বাঁদিকের প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি 'আ' আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুর ধ্বনি 'ই' মিলে ডানদিকে দুটোকে মিশিয়ে, সন্ধি করে একসঙ্গে বদলে দিচ্ছে 'এ' ধ্বনিতে। ১, ২, ৩ আর ৬, ৭, ৮ ধ্বনিগুলো একই থাকল; কেবল ৪ + ৫ = (✶) এইভাবে বদলে গেল। স্বরধ্বনি আর স্বরধ্বনিতে সন্ধিতে নতুন স্বরধ্বনি তৈরি হলো, তাই এটা

স্বরসন্ধি, এটা তোমরা জানতে। আবার **দ্বিতীয় নিয়মে দুটো ধ্বনি জুড়বার পর তারই মধ্যে একটা ধ্বনি, সন্ধির ফলে তৈরি ধ্বনি হচ্ছে।** যেমন :

পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষাই + ঈ = ঈ

মহা + আশয় = মহাশয় আ + আ = আ

তৃতীয় নিয়মে বাঁদিকের দুটো ধ্বনি জোড়ার পর ডানদিকে সেটা দুটো নতুন ধ্বনি হচ্ছিল (যুক্তব্যঞ্জন)। যেমন :

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস ত্ + শ্ = চ্ছ (চ্ + ছ্)

উৎ + হত = উদ্ধত ত্ + হ্ = দ্ধ (দ্ + ধ)

চতুর্থ নিয়মে বাঁদিকের দুটো ধ্বনি জোড়ার পর ডানদিকে সন্ধিযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনিটা কেবল বদলাচ্ছিল, কিন্তু দ্বিতীয় শব্দের প্রথম ধ্বনিটা একই থাকছিল। যেমন :

বিপদ + জনক = বিপজ্জনক

দ্ + জ্ = জ্জ (জ্ + জ্)

চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র ত্ + চ্ = চ্চ (চ্ + চ্)

সৎ + ইচ্ছা = সদিচ্ছা ত্ + ই = দি (দ্ + ই)

বাক্ + আড়ম্বর = বাগাড়ম্বর

ক্ + আ = গা (গ্ + আ)

পঞ্চম নিয়মে বাঁদিকের দুটো ধ্বনি জোড়ার পর ডানদিকেও সে দুটোই থাকে এবং তার সঙ্গে একটা অতিরিক্ত ধ্বনি যুক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

যেমন :

কথা + ছলে = কথাচ্ছলে

আ + ছ্ = আচ্ছ (আ + চ্ + ছ্)

পরি + ছেদ = পরিচ্ছেদ

ই + ছ্ = ইচ্ছ (ই + চ্ + ছ্)

অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ

উ + ছ্ = উচ্ছ (উ + চ্ + ছ্)

পরের নিয়মগুলিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জন অথবা স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সন্ধি হচ্ছে। এগুলির নাম **ব্যঞ্জনসন্ধি,** এটাও তোমরা শিখে গেছ। বাকি রয়েছে যেটা, এবার সেই সন্ধিটা শেখার পালা। এটার নাম হলো **বিসর্গসন্ধি।**

শুরুটার কখনো অন্য একটা শুরু থাকে। বিসর্গসন্ধি শুরুর আগে তাহলে সেই বিসর্গটাকে নিয়ে শুরু করা যাক। একটু ভেবে বলো দেখি বিসর্গ (ঃ) জিনিসটা শব্দের মধ্যে কোথায় কোথায় বসে — শুরুতে, মাঝখানে, শেষে সবজায়গাতেই কি?

কী খুঁজে পেলে? মাঝে বসছে কিংবা শেষে বসছে, কিন্তু শুরুতে নয় — তাই তো? এটা

নিশ্চয়ই তোমরা খেয়াল করেছ যে, বাংলায় বিসর্গ (ঃ)-র মতোই অনুস্বর (ং), অন্তঃস্থ-অ (য়), খণ্ড-ত (ৎ) — এরকম কয়েকটা অক্ষর কোনো শব্দেরই গোড়ায় বসতে পারে না।

পুনঃ, অন্তঃ, প্রাতঃ, অহঃ, — এগুলির ক্ষেত্রে শেষে বিসর্গ বসছে।

দুঃখ, দুঃসহ, দুঃসময়, দুঃসাধ্য, স্বতঃস্ফূর্ত, নিঃস্পন্দ — এগুলির ক্ষেত্রে মাঝে বিসর্গ বসছে।

প্রথম শব্দের শেষ ধ্বনি আর দ্বিতীয় শব্দের শুরুর ধ্বনি যুক্ত হলে যেভাবে স্বরসন্ধি কিংবা ব্যঞ্জনসন্ধি হতো — বিসর্গসন্ধির ক্ষেত্রে প্রথমেই বুঝতে পারছ যে, ব্যাপারটা একটু আলাদা হচ্ছে। তার মানে, এবার প্রথম শব্দের শেষে বিসর্গ থাকলেও,পরের শব্দের শুরুতে কখনোই বিসর্গ থাকতে পারে না। তাহলে বিসর্গসন্ধির একটা মূল নিয়ম শেখা হয়ে গেল।

প্রথম শব্দের শেষে অবস্থিত বিসর্গের সঙ্গে পরের শব্দটির শুরুতে থাকা স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত হলে সন্ধির ফলে তা নতুন শব্দে অন্য ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়। একেই আমরা বিসর্গসন্ধি বলে থাকি।

শব্দের শেষে বিসর্গচিহ্ন দিয়ে সেই বানান অনুযায়ী বাংলা লেখার চল এখন ক্রমশই কমে যাচ্ছে। তাই অন্ততঃ, তৃতীয়তঃ, ক্রমশঃ এই জাতীয় শব্দগুলিকে আমরা অন্তত, তৃতীয়ত, ক্রমশ — এমন বানানেই লিখতে অভ্যস্ত। তাহলে **বিসর্গ দিয়ে শেষ হচ্ছে, এমন শব্দই যদি বাংলায় বেশি না থাকে তবে বিসর্গসন্ধি হবে কেমন করে?** এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের একটু অন্যভাবে ভেবে বের করতে হবে।

দেখো, সন্ধির নিয়ম অনুযায়ী আমরা যে-পাঁচটা সূত্রের কথা জানি সেখানে দেখেছি বাঁ দিকের

ধ্বনিগুলি সন্ধির ফলে ডানদিকে এমনভাবে বদলে যেতে পারে যে সন্ধির ফলে তৈরি নতুন ধ্বনিতে আমরা মূল শব্দের ধ্বনিকে খুঁজেই পাব না। বিসর্গসন্ধির ফলে তৈরি শব্দগুলির ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়। **আমরা এমন অনেক শব্দ হামেশাই ব্যবহার করি যেগুলি বিসর্গসন্ধি হয়ে তৈরি হয়েছে। অথচ এই শব্দগুলির মধ্যে যে বিসর্গ লুকিয়ে আছে, বা অন্য কোনো ধ্বনি সেজে বসে আছে - সেটা ওই ছদ্মবেশটার জন্যে চেনা যায় না।**

তোমরা বহুরূপী দেখেছ? রং মেখে, মুখোশ পরে, পোশাক চাপিয়ে কখনো সে বাঘ সাজছে তো কখনো ভালুক। একদিন ছৌ নাচে রাক্ষস সাজে তো আরেকদিন সাজে সিংহ! লোকটা কিন্তু একটাই লোক। কী করবে বেচারা ! নানারকম

না সাজলে তোমরা মজা পাবে না। বিসর্গ বেচারিরও দশাটা তেমনি।

এবার কয়েকটা শব্দ খেয়াল করো :

তপোবন, পুনরুজ্জীবন, পুরস্কার

এরপরে আমরা এই শব্দগুলিকে ভেঙে সন্ধিবিচ্ছেদ করে মূলশব্দগুলিকে দেখাব :

তপোবন = তপঃ + বন

পুনরুজ্জীবন = পুনঃ + উজ্জীবন

পুরস্কার = পুরঃ + কার

দেখতেই পাচ্ছ যে, প্রত্যেকবার প্রথম শব্দগুলি বিসর্গ দিয়ে শেষ হচ্ছে। সেই বিসর্গগুলিই সন্ধির ফলে তৈরি শব্দে নানারকম ধ্বনি সেজে বসছে। বিসর্গের এই গিরগিটির মতো বহুরূপী হয়ে রং বদলানো কেমন, সেটাও দেখে নিই :

১. (ত্ + অ + প্ + ঃ) + (ব্ + অ + ন্)

= ত্ + অ + প্ + ও + ব্ + অ + ন্ (তপোবন)

২. (প্ + উ + ন্ + অ + ঃ) + (উ + জ্ + জ্ + ঈ + ব্ + অ + ন্)

= প্ + উ + ন্ + অ + র্ + উ + জ্ + জ্ + ঈ + ব্ + অ + ন্ (পুনরুজ্জীবন)

৩. (প্ + উ+ র্ + অ + ঃ) + (ক্ + আ + র্)

= প্ + উ + র্ + অ + স্ + ক্ + আ + র্ (পুরস্কার)

তাহলে বাঁদিকে আর ডানদিকের ধ্বনিগুলো তুলনা করলেই ধরে ফেলতে পারছ যে, তিনটি শব্দের ক্ষেত্রেই দুদিকের ধ্বনির সংখ্যা এক রয়েছে। প্রথম শব্দের চার নম্বর (ঃ)-টা (ও) ধ্বনি রয়ে গেছে। দ্বিতীয় শব্দের পাঁচ নম্বর ধ্বনিটা (ঃ) এবং সন্ধির ফলে সেটা (র) হয়ে গেছে। আর তৃতীয় শব্দের পাঁচনম্বর ধ্বনি (ঃ) টা বদলে গিয়ে

(স) হয়ে গেছে। বিসর্গসন্ধির ফলে বিসর্গটির কতরকম বদল হতে পারে এবার সেগুলি সাজিয়ে নেব।

(১) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (ও) হয়।

(২) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (স) / (শ) / (ষ) হয়।

(৩) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (র) হয়।

(৪) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরিত হয়ে (´) রেফ হয়।

(৫) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরের সময় লুপ্ত হয়।

(৬) বিসর্গধ্বনি (ঃ) রূপান্তরের সময় লুপ্ত হয়, কিন্তু তার আগের স্বরধ্বনিটিকে দীর্ঘ করে।

বহুরূপী বিসর্গটার আরেকটা পরিচয় দেওয়া বাকি আছে। যে সব শব্দের মধ্যে বিসর্গ (ঃ) টাকে একটা বর্ণ বা অক্ষর হিসেবে শব্দের মধ্যে দেখতে পাও, তার উচ্চারণটা খেয়াল করলে বুঝতে

পারবে সেটা কেমন অন্য ধ্বনির মতো আচরণ করছে। যেমন —

নিঃস্পন্দ = নিস্, স্পন্দ

দুঃখ = দুক্, খ

দুঃসময় = দুস্, সময়

স্বতঃস্ফূর্ত = স্বতস্, স্ফূর্ত

এবারে আমরা বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে বিসর্গসন্ধির যে ছটা নিয়মের কথা বলেছিলাম, সেগুলিকে চিনে নেব।

সূত্র : ১।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (ও) হচ্ছে, ও-কার হচ্ছে

অধঃ + মুখ = অধোমুখ

ছন্দঃ + বন্ধ = ছন্দোবন্ধ

মনঃ + বাসনা = মনোবাসনা

শিরঃ + ধার্য = শিরোধার্য

মনঃ + রম = মনোরম

তিরঃ + ধান = তিরোধান

ততঃ + অধিক = ততোধিক

মনঃ + রম = মনোরস

অকুতঃ + ভয় = অকুতোভয়

নভঃ + মণ্ডল = নভোমণ্ডল

সূত্র : ২।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (স), (শ) আর (ষ) হচ্ছে, যুক্তব্যঞ্জন হিসেবে

ভাঃ + কর = ভাস্কর

মনঃ + কামনা = মনস্কামনা

স্রোতঃ + বান = স্রোতস্বান

নিঃ + তেজ = নিস্তেজ

পুরঃ + কার = পুরস্কার

তিরঃ + কার = তিরস্কার

সরঃ + বতী = সরস্বতী

মনঃ + তাপ = মনস্তাপ

* এই উদাহরণগুলিতে (স) ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

নিঃ + চয় = নিশ্চয়

নিঃ + চিন্ত = নিশ্চিন্ত

অয়ঃ + চক্র = অয়শ্চক্র

নভঃ + চর = নভশ্চর

নিঃ + ছিদ্র = নিশ্ছিদ্র

দুঃ + চিন্তা = দুশ্চিন্তা

নিঃ + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট

মনঃ + চক্ষু = মনশ্চক্ষু

* এই উদাহরণগুলিতে (শ) ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

নিঃ + ঠুর = নিষ্ঠুর

নিঃ + প্রয়োজন = নিষ্প্রয়োজন

নিঃ + কাম = নিষ্কাম

পরিঃ + কার = পরিষ্কার

চতুঃ + পার্শ্ব = চতুষ্পার্শ্ব

দুঃ + কর = দুষ্কর

ধনুঃ + টঙ্কার = ধনুষ্টঙ্কার

নিঃ + কৃতি = নিষ্কৃতি

নিঃ + ফল = নিষ্ফল

আবিঃ + কার = আবিষ্কার

চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ

ভ্রাতুঃ + পুত্রী = ভ্রাতুষ্পুত্রী

* এই উদাহরণগুলিতে (ষ) ধ্বনিতে রূপান্তর ঘটেছে।

সূত্র : ৩।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (র) হচ্ছে

অন্তঃ + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়

অন্তঃ + আত্মা = অন্তরাত্মা

নিঃ + অতিশয় = নিরতিশয়

নিঃ + আকার = নিরাকার

নিঃ + আনন্দ = নিরানন্দ

নিঃ + ঈহ = নিরীহ

নিঃ + আমিষ = নিরামিষ

দুঃ + অবস্থা = দুরবস্থা

পুনঃ + অপি = পুনরপি

প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ

পুনঃ + আবিষ্কার = পুনরাবিষ্কার

নিঃ + অবধি = নিরবধি

দুঃ + আত্মা = দুরাত্মা

নিঃ + অঙ্কুশ = নিরঙ্কুশ

নিঃ + উদ্বেগ = নিরুদ্বেগ

চতুঃ + অঙ্গ = চতুরঙ্গ

সূত্র : ৪।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে (র্) রেফ হচ্ছে, রেফটি পরের ব্যঞ্জনে যুক্ত হয়

জ্যোতিঃ + বিজ্ঞান = জ্যোতির্বিজ্ঞান

পুনঃ + বার = পুনর্বার

অহঃ + নিশ = অহর্নিশ

বহিঃ + জগৎ = বহির্জগৎ

দুঃ + দান্ত = দুর্দান্ত

দুঃ + ধর্ষ = দুর্ধর্ষ

নিঃ + মোহ = নির্মোহ

নিঃ + নয় = নির্ণয়

অন্তঃ + লীন = অন্তর্লীন

অন্তঃ + গত = অন্তর্গত

নিঃ + লোভ = নির্লোভ

নিঃ + বিকার = নির্বিকার

সূত্র : ৫।। বিসর্গ রূপান্তরিত হয়ে লুপ্ত হচ্ছে

অতঃ + এব = অতএব

সদ্যঃ + পাতি = সদ্যপাতি

সদ্যঃ + উত্থিত = সদ্যউত্থিত

নিঃ + স্তব্ধ = নিস্তব্ধ

মনঃ + স্থ = মনস্থ

নিঃ + স্পন্দ = নিস্পন্দ

যশঃ + ইচ্ছা = যশইচ্ছা

সদ্যঃ + উচ্চারিত = সদ্যউচ্চারিত

সদ্যঃ + উদ্ভূত = সদ্যউদ্ভূত

সূত্র : ৬।। বিসর্গ লুপ্ত হয়ে আগের স্বরধ্বনিকে দীর্ঘ করছে

নিঃ + রব = নীরব

নিঃ + রোগ = নীরোগ

নিঃ + রস = নীরস

চক্ষুঃ + রোগ = চক্ষূরোগ

স্বঃ + রাজ্য = স্বারাজ্য

নিঃ + রন্ধ্র = নীরন্ধ্র

সূত্র : ৭।। বিসর্গ পরিবর্তিত না হয়ে এক থেকে গেছে

মনঃ + ক্ষুণ্ণ = মনঃক্ষুণ্ণ

দুঃ + সাধ্য = দুঃসাধ্য

স্বতঃ + সিদ্ধ = স্বতঃসিদ্ধ

প্রাতঃ + কাল = প্রাতঃকাল

স্রোতঃ + পথ = স্রোতঃপথ

অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর

হাতেকলমে

১.সন্ধিতে কতরকম নিয়মে দুটি ধ্বনি যুক্ত হয়? এই নিয়মগুলির প্রত্যেকটি একটি করে উদাহরণ দিয়ে দেখাও। বিসর্গসন্ধির ক্ষেত্রে কোন নিয়ম খাটে?

২.বিসর্গসন্ধির ফলে বিসর্গটি কোন কোন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হতে পারে? প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

৩.নীচে উল্লিখিত বাক্য থেকে বিসর্গ সন্ধিযুক্ত পদগুলিকে চিহ্নিত করো :

৩.১ অহোরাত্র পরিশ্রম করে শেষে তার পুরস্কার পেলাম।

৩.২ নিরামিষ নানা পদ দিয়ে প্রাতরাশ সারলেন।

৩.৩ দুরবস্থার কিছুটা উন্নতি হলে মনোবাসনা পূর্ণ হতে পারে।

৩.৪ চতুস্পার্শ্ব পরিষ্কার রাখলে মশার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

৩.৫ নিস্তব্ধ বাড়িতে বসে দুর্দান্ত সব জোতির্বিজ্ঞানের আবিষ্কার করেন।

৪.নীচের পদগুলিকে বিসর্গসন্ধির নিয়মে বিশ্লেষণ করো :

মনোবাঞ্ছা, সরোজ, নিরীশ্বর, আবিষ্কার, অহর্নিশ, পরিষ্কার, চতুরানন, নির্মোহ

৫.বিসর্গসন্ধিতে কীভাবে বিসর্গ(ঃ) টি কখনো(র) ধ্বনিতে বা কখনো (ঁ) রেফ-এ রূপান্তরিত হয়—দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাও।

৬.**(শ), (ষ), (স)**— বিসর্গসন্ধির ফলে কীভাবে সন্ধিবদ্ধ পদে এই তিনটি ধ্বনি সৃষ্টি হয়—দৃষ্টান্ত দিয়ে দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শব্দের গঠন

১. শব্দগঠন : মৌলিক শব্দ ও যৌগিক শব্দ

সভ্যতার ইতিহাসে মানুষ আগে কথা বলতে শিখেছে। লিখতে শিখেছে আরো অনেক পরে। একটি শিশুও তাই প্রথমে অন্যদের কথা শোনে। তারপর তার অনুকরণ করে কিছু কিছু উচ্চারণ করতে চায়। লিখতে এবং পড়তে শেখে একটু একটু করে বড়ো হলে।

কথা বলার **শব্দ**গুলি তাই তৈরি হয় মুখের ভাষার **ধ্বনি** দিয়ে। এগুলি দু-রকম : **স্বরধ্বনি** ও **ব্যঞ্জনধ্বনি**।

লেখার ভাষার **শব্দ**গুলি প্রকাশ করতে হয় সেইসব ধ্বনির লিপিরূপ দিয়ে। এগুলিকে বলা হয় **বর্ণ** বা **অক্ষর**।

একটি শব্দের গঠনে একটি ধ্বনি যেমন থাকতে পারে, তেমনি একাধিক ধ্বনিও থাকতে পারে। আবার শব্দটিকে যেসব বর্ণ দিয়ে লিখি, শব্দটির উচ্চারণে অন্য ধ্বনি থাকতে পারে। যেমন :

একটি — এখানে 'এ' বর্ণটির উচ্চারণ 'এ' ধ্বনির মতো

একটা — এখানে 'এ' বর্ণটির উচ্চারণ 'অ্যা' ধ্বনির মতো

অবাক — এখানে 'অ' বর্ণটির উচ্চারণ 'অ' ধ্বনির মতো

অতি — এখানে 'অ' বর্ণটির উচ্চারণ 'ও' ধ্বনির মতো

এবার দেখে নিই বিভিন্ন শব্দের গঠনে কীভাবে ধ্বনিগুলি থাকে :

ও — ও (একটি স্বরধ্বনির সাহায্যে গঠিত)

চা — চ্ + আ

(একটি স্বর + একটি ব্যঞ্জন = দুটি ধ্বনি)

অভীক — অ + ভ্ + ঈ + ক্

(দুটি স্বর + দুটি ব্যঞ্জন = চারটি ধ্বনি)

প্রজাপতি — প্ + র্ + অ+ জ্ + আ + প্ + অ + ত্ +ই (পাঁচটি ব্যঞ্জন + চারটি স্বর = নটি ধ্বনি)

উচ্চারণ করার সময় : ও, চা, দে, স্ত্রী, বল্, দিক, চুল, প্রায় — এই শব্দগুলি আমরা একবারের চেষ্টাতেই উচ্চারণ করে ফেলতে পারি।

কিন্তু শব্দ যদি মাঝারি বা বড়ো আকারের হয়, তাহলেই আর সেগুলো একবারের চেষ্টায় উচ্চারণ করা যায় না। যেমন :

কোন্দল : কোন্, দল্ (২টি)

কোলাহল : কো, লা, হল্ (৩টি)

চঞ্চলতা : চন্, চ, ল, তা (৪টি)

কলাকুশলী : ক, লা, কু, শ, লী (৫টি)

আরব্যরজনি : আ, রোব্, বো, র, জ, নি (৬টি)

অতিবেগুনিরশ্মি : অ, তি, বে, গু, নি, রোশ্, শি (৭টি)

এইভাবে শব্দের উচ্চারণের সময় যে ভাঙা টুকরোগুলি পেলাম (যেমন : শ, রোব্, জ, নী, রোশ্) সেগুলির কোনো অর্থ হয় না। এগুলি কেবল এক একবারে যতটা করে উচ্চারণ করা যায়, ততটুকু অংশ। এবার যদি অর্থের দিকে তাকাও তাহলে দেখো শব্দগুলি কেমন হচ্ছে :

অতিবেগুনিরশ্মি : অতি বেগুনি রশ্মি

আরব্যরজনি	:	আরব্য রজনি
কলাকুশলী	:	কলা কুশলী
চঞ্চলতা	:	চঞ্চলতা
কোলাহল	:	কোলাহল
কোন্দল	:	কোন্দল

প্রথম তিনটির ক্ষেত্রে একের বেশি শব্দ জুড়ে ছিল। শেষ তিনটি শব্দে ওরকম গোটা গোটা শব্দ জুড়ে নেই। কিন্তু শেষ তিনটি শব্দও কোনো কোনো টুকরো জুড়ে তৈরি হয়েছে। যেমন :

চঞ্চলতা : √ চঞ্চ্ + অল + তা

কোলাহল : কোলা (√ কুল্ +আ) হল (√ হল্ + অচ্)

কোন্দল : √ কন্দি + অল

আবার তার আগের শব্দগুলিতেও কুশলী, রশ্মি, রজনী — এই শব্দগুলিকেও আরও ভেঙে

টুকরো করা যায়। (√ চঞ্চ্, √ কুল্ জাতীয় ভাঙাগুলি কী বোঝাচ্ছে, তা পরে বলা হবে।)

তাহলে দেখো বাংলায় এমন অনেক শব্দ রয়েছে যেগুলি দুটি বা দুইয়ের বেশি শব্দ জুড়ে তৈরি হয়েছে। আবার যে শব্দগুলিকে একটা শব্দ বলে মনে হচ্ছে সেগুলিকেও নানাভাবে আরও ছোটো টুকরো করা যায়।

সুতরাং যেসব শব্দকে ভাঙলে ছোটো কয়েকটি অর্থপূর্ণ শব্দ বা অন্যক্ষেত্রে মূল শব্দটির সঙ্গে অর্থ সম্পর্কযুক্ত শব্দাংশ বা খণ্ড পাওয়া যায়, সেগুলিকে বলা হয় **সাধিত শব্দ** বা **যৌগিক শব্দ**। যেমন : আপাদমস্তক, খামচাখামচি, মুশকিলআসান, ডাক্তারবাবু, বিয়েবাড়ি, ফুটন্ত, বিত্তবান, বাঁদরামি, খাইয়ে, পাণ্ডিত্য ইত্যাদি।

সাধিত শব্দগুলি যেভাবে গঠিত হয় সেই অনুযায়ী এগুলিকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

(১) জোড়বাঁধা সাধিত শব্দ : দুই বা দুইয়ের বেশি শব্দ জুড়ে যখন একটি সাধিত শব্দে রূপান্তরিত হয়, তখন সেগুলি জোড়বাঁধা সাধিত শব্দ। এগুলিকেও আবার দুটো ভাগ করা যায়—

(১.১) শব্দদুটির সন্ধি হয়েছে এমন সাধিত শব্দ	(১.২) শব্দদুটির সন্ধি হয়নি এমন সাধিত শব্দ
বাগাড়ম্বর, দশানন, বিদ্যালয়, নীলাম্বর, গ্রন্থাগার, সিংহাসন	তেলেভাজা, পটলতোলা, জলখাবার গোঁসাইবাগান, দিনকাল, হাটবাজার

(২) শব্দখণ্ড বা শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ : শব্দের সঙ্গে বা ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ বা খণ্ড জুড়ে একটি সাধিত শব্দে রূপান্তরিত হয়, এগুলিও দু-রকম হয়—

(২.১) শব্দের সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ :

—তম	প্রিয় + তম = প্রিয়তম, ক্ষুদ্র + তম = ক্ষুদ্রতম, শ্রেষ্ঠ + তম = শ্রেষ্ঠতম
— ইক	সমুদ্র + ইক = সামুদ্রিক, মাস + ইক = মাসিক, ধর্ম + ইক = ধার্মিক
—তা	ব্যর্থ + তা = ব্যর্থতা, নীচ + তা = নীচতা, সহযোগী + তা = সহযোগিতা
—আই	খাড়া + আই = খাড়াই, বড়ো + আই = বড়াই, চোর + আই = চোরাই
— ময়	দয়া + ময় = দয়াময়, জল + ময় = জলময়, স্বপ্ন + ময় = স্বপ্নময়

(২.২) ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ :

যেসব শব্দ দিয়ে কোনো কাজ করা (ক্রিয়া) বোঝায়, সেগুলির মূল অংশ বা সার অংশকে বলে ধাতু। এগুলিকে আমরা আগে √ —চিহ্নটির সাহায্যে দেখিয়েছি। √ কর্, √ চল্, √ খা — এরকম অনেক ধাতুরূপ রয়েছে। এগুলির শেষেও নানা শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ তৈরি করে—

—অক	√ দৃশ্ + অক = দর্শক, √ নৈ + অক = নায়ক, √ পঠ্ + অক = পাঠক
— অন্ত	√ ফুট্ + অন্ত = ফুটন্ত, √ জ্বল্ + অন্ত = জ্বলন্ত, √ ডুব্ + অন্ত = ডুবন্ত
—ই	√ হাস্ + ই = হাসি, √ ঝুঁক্ + ই = ঝুঁকি, √ ফির্ + ই = ফিরি

এতক্ষণ ধরে যত শব্দ দেখলে সবগুলি তাহলে ভাঙা যাচ্ছে আর টুকরোগুলি অর্থপূর্ণ হচ্ছে, তাই এগুলি সবই সাধিত বা যৌগিক শব্দ। কিন্তু এছাড়াও আরও এক ধরনের শব্দগঠন আমরা দেখতে পাব।

যেসব শব্দকে আর ভাঙা যায় না বা শব্দটির থেকে ছোটো খণ্ডে ভাঙলে তার আর কোনো অর্থ পাওয়া সম্ভব নয়, সেই জাতীয় অবিভাজ্য শব্দগুলিকে সিদ্ধ শব্দ বা মৌলিক শব্দ বলে।

এরকম মৌলিক শব্দের উদাহরণ হলো :

লাল, নীল, সাদা, কালো, হলুদ, সবুজ

হাত, পা, মুখ, মাথা, নাক,চোখ, কান

এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট

দিন, রাত, হাতি, ঘোড়া, জল, বাবা, মা ইত্যাদি আরও অসংখ্য শব্দ।

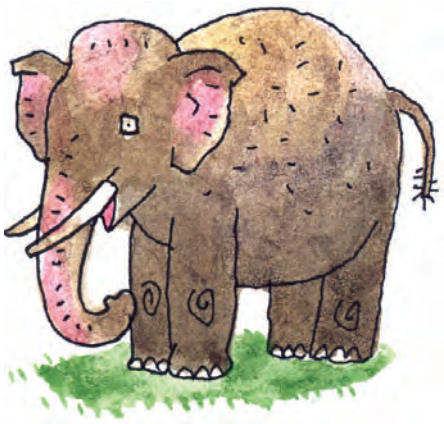

এই শব্দগুলিকে যদি ভাঙো তবে যে টুকরোগুলি পাওয়া যাবে, তার কোনো অর্থ হয় না।

যেমন : মাথা (মা + থা), হাতি (হা + তি), বাবা (বা + বা)।

সুতরাং শব্দের গঠন অনুযায়ী আমরা দুটো ভাগ পেলাম : **যৌগিক/সাধিত শব্দ** আর **মৌলিক/সিদ্ধ শব্দ।**

এবার দেখব যে অর্থ অনুযায়ীও শব্দকে ভাগ করা হয়। এইভাবে ভাগ করে শব্দের আরও তিনটি শ্রেণির কথা বলা হয়।

এখানে আরেকটা নতুন শব্দ জানব। সেটা হলো শব্দের **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** (ইংরেজিতে একে বলে etymological meaning বা বিষয়টিকে বলে etymology। সাধিত শব্দের মূল অংশ এবং সংযুক্ত খণ্ড অংশগুলিকে যেভাবে ভেঙেছিলে তার সাহায্যে সেই শব্দটির যে উৎপত্তি বোঝা যায়, তাকে বলে ব্যুৎপত্তি। সেভাবে শব্দটির যে অর্থ জানা যায় তাকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বলে। কোনো কোনো শব্দের মানে সেই ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে এক থাকলেও কোনো কোনো শব্দের মানে আবার বদলেও যায়। ব্যুৎপত্তিগত অর্থটাই সেই শব্দের আদি অর্থ বা মূল অর্থ। কিন্তু অনেক সময় তা পালটে গিয়ে এখন আমরা শব্দটার যে মানে বুঝি, তাকে বলব **প্রচলিত অর্থ** বা **ব্যবহারিক অর্থ**।

এবার এই **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ** আর **প্রচলিত অর্থ** — এই দুটির মধ্যে তিনরকম সম্পর্ক থেকে শব্দগুলিকে তিনরকম শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই ভাগগুলির বৈশিষ্ট্য হলো—

শব্দের শ্রেণি	শব্দের বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
অপরিবর্তিত যৌগিক শব্দ	এই জাতীয় সাধিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থ একই রয়েছে।	**পাঠক = √পঠ্ + অক** 'পঠ্' হলো পাঠ করা বা পড়া এবং 'অক' বলতে কর্তৃত্ব বোঝায়। এর মানে হলো পাঠকর্তা বা যিনি পাঠ করেন। সুতরাং, ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যা ছিল প্রচলিত অর্থও তাই।

শব্দের শ্রেণি	শব্দের বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
পরিবর্তিত যৌগিক শব্দ	এই জাতীয় শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের থেকে প্রচলিত অর্থ এতটাই আলাদা হয়ে গেছে যে মূলরূপের সঙ্গে ব্যবহারিক রূপের সম্পর্ক নেই বলে মনে হয়।	**মহাজন**-এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যে ব্যক্তি মহান বা মহৎ। (যেমন : মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ) কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ হয়ে গেছে সুদব্যবসায়ী, অর্থাৎ যে টাকা ধার দিয়ে চড়া সুদ নেয়। সুতরাং, তাকে মহান ব্যক্তি নিশ্চয়ই বলা যায় না।

শব্দের শ্রেণি	শব্দের বৈশিষ্ট্য	উদাহরণ
সংকুচিত যৌগিক শব্দ	এই জাতীয় সাধিত শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অনেক কিছু বা ব্যাপকতা বোঝালেও প্রচলিত অর্থ তারই মধ্যে কোনোটিকে বোঝায় বা অর্থে প্রয়োগ হয়।	**তুরঙ্গম** -এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো যা-কিছু দ্রুতগমন করতে পারে বা তাড়াতাড়ি যেতে পারে। যেহেতু দ্রুতগামী প্রাণী তাই এর প্রচলিত অর্থ হলো **ঘোড়া**।

এই জাতীয় আরও কিছু শব্দের উদাহরণ :

শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ	শব্দশ্রেণি
অন্ন	যে-কোনো খাদ্যবস্তু	ভাত	যৌগিক সংকুচিত
পান	গাছের পাতা (পর্ণ)	তাম্বুল	যৌগিক সংকুচিত
মৃগ	বনের পশু	হরিণ	যৌগিক সংকুচিত
প্রদীপ	যে-কোনো আলো	নির্দিষ্ট আকারের মাটি বা ধাতুর আলোকপাত্র	যৌগিক সংকুচিত
পঙ্কজ	যা পাঁকে জন্মায়	পদ্মফুল	যৌগিক সংকুচিত
আদিত্য	দেবমাতা অদিতির পুত্র সব দেবতা	সূর্যদেব	যৌগিক সংকুচিত

শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ	শব্দশ্রেণি
জলদ	যা জল দান করতে পারে	মেঘ	যৌগিক সংকুচিত
মন্দির	যে-কোনো গৃহ/বাসস্থান	দেবতার গৃহ	যৌগিক সংকুচিত
কুশল	যে কুশ তুলতে পারে	নিপুণ/পারদর্শী/মঙ্গল	যৌগিক পরিবর্তিত
প্রবীণ	যিনি বীণা বাজাতে পটু	বয়স্ক ব্যক্তি	যৌগিক পরিবর্তিত
সন্দেশ	সংবাদ/খবর	মিষ্টি খাবার	যৌগিক পরিবর্তিত
গোষ্ঠী	গোরুর থাকার জায়গা /গোয়াল	দল/সমূহ	যৌগিক পরিবর্তিত
গবাক্ষ	গোরুর চোখ	জানালা	যৌগিক পরিবর্তিত
ঝি	কন্যা/মেয়ে	পরিচারিকা	যৌগিক পরিবর্তিত
জলপানি	জলখাবার/ লঘুভোজন	ছাত্রবৃত্তি	যৌগিক পরিবর্তিত

শব্দ	ব্যুৎপত্তিগত অর্থ	প্রচলিত অর্থ	শব্দশ্রেণি
গবেষণা	গোরু খোঁজা	গভীর বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান	যৌগিক পরিবর্তিত
জলজ	যা কিছু জলে জন্মায়	একই	যৌগিক অপরিবর্তিত
পালনীয়	যা পালন করা উচিত	একই	যৌগিক অপরিবর্তিত
ধীরগামী	যা ধীরে ধীরে যাচ্ছে	একই	যৌগিক অপরিবর্তিত

তাহলে গঠন অনুযায়ী আর অর্থ অনুযায়ী শব্দকে যেমনভাবে ভাঙা হয় তেমন একটি শাখাচিত্র তৈরি করে মনে রাখি :

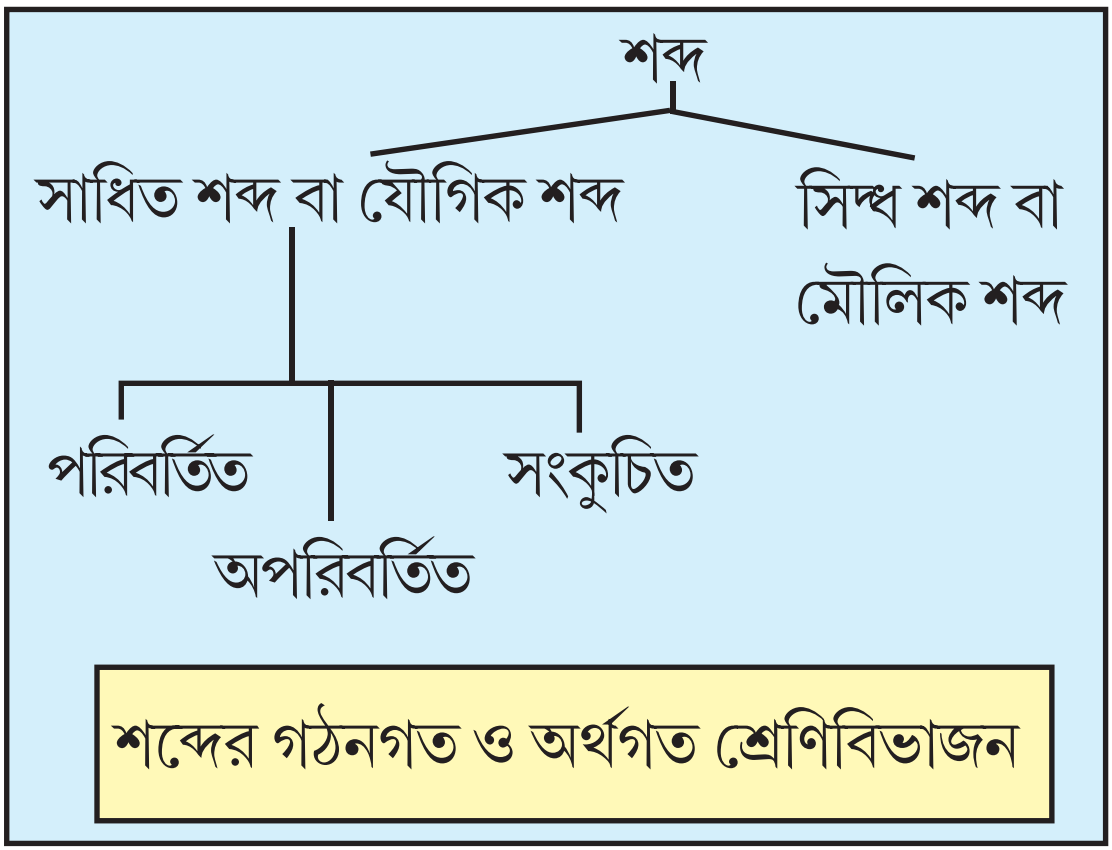

২. সংখ্যাবাচক শব্দ

সংখ্যা শুধু অঙ্ক করার জন্য আমাদের জানতে হয় এমন নয়। দিন, বছর, মাস, জিনিসপত্রের দাম, কোনো কিছুর পরিমাণ, দূরত্ব বা ওজন, বয়স

— এমনই অনেককিছুর সঙ্গে সংখ্যার সম্পর্ক। আমাদের প্রতিদিনের জীবন নানারকম সংখ্যা ছাড়া অচল। নানা ভাষাতে তাই সংখ্যার নানারকম নাম পাওয়া যায়। এরকম কয়েকটা ভারতীয় ভাষায় সংখ্যাগুলির নাম কেমন হয়, দেখো :

বাংলায়	হিন্দি/উর্দু	ওড়িয়া	গুজরাটি	সংস্কৃত
এক্	ইক্	গোটে	এক্	এক
দুই	দো	বেণি	বে	দ্বি
তিন	তিন্	তিনি	ত্রাণ্	ত্রি

দশ পর্যন্ত সংখ্যার নাম কতরকম হয়, দেখো :

ইংরেজি	তামিল	আরবি	চিনা
ওয়ান	ওণ্ররু	আহাদুন	ই
টু	এর্রাণ্ডু	ইসনা উন্	নি

ইংরেজি	তামিল	আরবি	চিনা
থ্রি	মুনরু	সালসাতুন	শ্যাম
ফোর	নান্ গু	আরবাতুন	শি
ফাইভ	আইন্ দু	খামসুন্	উম
সিক্স	আরু	সেত্তাতুন	লু
সেভেন	এলু	সবা'তুন	চি
এইট	এট্টু	সমানিয়াতুন	প্যাট্
নাইন	ওন্বাদু	তিস্আ'তুন	কিউ
টেন	পাট্ঠু	আশর্তুন্	সুব

গ্রন্থঋণ : শ্রী পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য — বাংলাভাষা

এখানে যেমন নানা ভাষায় সংখ্যাগুলির নানারকম নাম পেলাম, তেমনই কিন্তু প্রত্যেক ভাষাতেই সংখ্যা লিখতে সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করা হয় আমাদেরই মতো। অর্থাৎ একটা সংখ্যার

অন্তত দুটো পরিচয় — প্রথমে তার চিহ্ন; তারপরে তার নাম।

চলো, চট করে চেনা জিনিসের দিকে তাকিয়ে ব্যাপারটা দেখে নিই —

সংখ্যা চিহ্ন	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
সংখ্যার নাম	এক	দুই	তিন	চার	পাঁচ	ছয়	সাত	আট	নয়

এখানে আমরা এককের ঘরের সংখ্যাগুলিকে দেখলাম। বাংলায় এই মূল সংখ্যাগুলির নামের বৈশিষ্ট্য হলো — প্রত্যেকটিই একবারের চেষ্টায় উচ্চারণ করতে পারি (অর্থাৎ এগুলি সব একদলবিশিষ্ট শব্দ)। যেই সংখ্যাগুলি বড়ো হয়ে দশক বা শতকের ঘরের সংখ্যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে শব্দগুলি উচ্চারণ করতে একের বেশিবার চেষ্টা

করতে হবে। (ব্যতিক্রম হলো : দশ, বিশ, ত্রিশ, ষাট এই শব্দ চারটি) যেমন : পনেরো (প, নে, রো), ছাপ্পান্ন (ছাপ্, পান্, ন), একশো পঁচিশ (এক, শো, পঁ, চিশ) ইত্যাদি।

সংখ্যাচিহ্ন ব্যবহার করে সংখ্যা লিখলেও আমরা সেই সংখ্যাগুলিকে যেসব নাম দিয়েছি সেগুলি বিশুদ্ধ গণনা সংখ্যা কিংবা ভগ্নাংশ, সবক্ষেত্রেই নামবাচক শব্দগুলিকে সংখ্যাশব্দ বা সংখ্যাবাচক শব্দ বলা হয়।

সংখ্যাশব্দগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ বা গণনা সংখ্যাশব্দ :

বাংলায় এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রত্যেকটি শব্দের নাম আলাদা। এর আগে উল্লেখ করা যায় 'শূন্য' শব্দনামটিকে। একশোর পর আবার

‘হাজার’, ‘লক্ষ’ এবং ‘কোটি’ শব্দ তিনটিকে ধরলে এগুলির সাহায্যেই সব সংখ্যার নাম বুঝিয়ে দেওয়া যায়। আগে ‘অযুত’ এবং ‘নিযুত’ শব্দদুটির প্রচলন থাকলেও এখন আর নেই। সেক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দ হচ্ছে ১০৪টি।

আগেকার দিনে চোক, পন, ছটাক, কড়া, গন্ডা — এমন কিছু শব্দও ব্যবহৃত হতো সংখ্যাবাচক হিসেবে। মহাভারতে সৈন্যসংখ্যা অনুযায়ী অক্ষৌহিণী, অনীকিনী জাতীয় সংস্কৃত সংখ্যাবাচক শব্দেরও ব্যবহার দেখা যায়। এগুলির আর এখন কোনো চল নেই।

বাংলা সংখ্যাবাচক শব্দের মধ্যে কিছু কিছু শব্দ দেশজ বা অনার্য উৎস থেকে আসছে। বেশিরভাগ সংখ্যাশব্দই আসলে আর্যভাষা কিংবা সংস্কৃত ভাষা থেকে পরিবর্তনের ফলে তৈরি হওয়া **তদ্ভব** জাতীয় একধরনের শব্দ।

দুই অঙ্কের সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রে বাংলা সংখ্যাশব্দে দেখবে আগে এককের ঘর এবং পরে দশকের ঘরের নাম আমরা বলে থাকি। যেমন : ৩১ যখন সংখ্যায় লিখি তখন দশকের ঘরে ৩ আগে, আর এককের ঘরে ১ পরে বসাই। কিন্তু এই সংখ্যাটিকে কথায় বলছি 'এক তিরিশ'। তাহলে এককের ঘরের সংখ্যাটা আগে বলে দশকের ঘরের নামটা পরে বলছি। কিন্তু ইংরেজি ভাষায় এই সংখ্যাটার নামশব্দ 'থারটি ওয়ান' — যেখানে আগের নামটা (দশক) আগে, আর পরের নামটা পরে (একক) বলা হচ্ছে। আবার শতকের ঘরের ক্ষেত্রে দেখো শতকের নামটা আগেই বলা হলো। একশো এক তিরিশ। অর্থাৎ 'শতক-একক-দশক' এইভাবে সংখ্যাশব্দটা বলা হচ্ছে। হাজার, লক্ষ বা কোটির ক্ষেত্রেও বাঁদিকে সংখ্যাটি যেভাবে বাড়ে তার নামটাও সেভাবেই

বলা হয়। এক কোটি চৌতিরিশ লক্ষ সাত হাজার তিনশো সাতানব্বই (১,৩৪,০৭,৩৯৭)। তাহলে বাংলা দু-অঙ্কের সংখ্যার নামগুলিতে দশকের পর একক না বলে এককের পর দশক --- এভাবেই সংখ্যাবাচক শব্দগুলি তৈরি হয়েছে।

দশের ঘরের সংখ্যাশব্দগুলির মধ্যে দুটি ছাড়া (চোদ্দো, ষোলো) সবই -'র' দিয়ে শেষ হচ্ছে। কুড়ির ঘরের সংখ্যাশব্দগুলি সবই - শ/ - ইশ/ -আশ/-উশ দিয়ে শেষ হচ্ছে।

তিরিশের ঘরে : -ত্রিশ/-তিরিশ দিয়ে (ব্যতিক্রম উনচল্লিশ)

চল্লিশের ঘরে : -ল্লিশ/-চল্লিশ দিয়ে (ব্যতিক্রম : উনপঞ্চাশ)

পঞ্চাশের ঘরে : -ন্ন দিয়ে (ব্যতিক্রম উনষাট)

ষাটের ঘরে : -ষট্টি দিয়ে (ব্যতিক্রম উনসত্তর)

সত্তরের ঘরে : -ত্তর দিয়ে (ব্যতিক্রম উনআশি)

আশির ঘরে : -আশি দিয়ে (ব্যতিক্রম উননব্বই)

নব্বইয়ের ঘরে : -নব্বই দিয়ে

১৯, ২৯, ৩৯, ৪৯, ৫৯, ৬৯, ৭৯, ৮৯ — এই সংখ্যাশব্দগুলির একটু বিশেষত্ব আছে। খেয়াল করে দেখো প্রত্যেকটার নামের শুরুতে 'ঊন' শব্দাংশটা বসছে। ঊন কথাটার মানে হলো : কিছুটা কম বা ন্যূন। তাহলে উনষাট মানে হলো ষাটের চেয়ে কম। বাকিগুলিও তাই। এবার দেখো তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশ সবগুলির ঘরে সংখ্যার নাম যেমনভাবে বাড়ছিল তাতে সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ-এর পর নয়ত্রিশ হতে পারত।

একইভাবে নয়চল্লিশ, নয়পঞ্চাশ, নয়ষাট ইত্যাদির বদলে সংখ্যাশব্দগুলির নামের মধ্যে পরের দশকটির সংখ্যাশব্দের নাম ঢুকে উনপঞ্চাশ, উনষাট, উনসত্তর হয়ে যাচ্ছে। ঊনকুড়ি না বলে যে উনিশ বলছি, কারণ ঊনবিংশ থেকে ঊনবিশ, এভাবে ক্রমে শব্দটা ছোটো হয়ে উনিশ হয়ে গেছে। তবে দেখো আগের তালিকায় একটা সংখ্যা লিখিনি - ৯৯ ; এটাকে আমরা বলি নিরানব্বই — আমরা কিন্তু ঊনশো বলি না। তাহলে 'ঊন' সংখ্যাশব্দগুলির মধ্যে এটার নামে একটা ব্যতিক্রম থাকছে।

বাংলায় মৌলিক বা বিশুদ্ধ সংখ্যাবাচক শব্দগুলি বিশেষ্য পদের আগে বসে সেটির সংখ্যা নির্দেশ করে। যেমন : শতবর্ষ, দেড়শো বছর, পাঁচ মাথার মোড়, সাত দিন, হাজার তারা, সাত কোটি সন্তান ইত্যাদি। সংখ্যাশব্দগুলি এক্ষেত্রে

বিশেষণ পদের মতো বিশেষ্যর বৈশিষ্ট্য বোঝায়। ইংরেজির অনুসরণে আবার রজতজয়ন্তী, সুবর্ণজয়ন্তী, হীরকজয়ন্তী শব্দগুলিও বাংলায় বছরের সংখ্যাই বোঝায়। বারো সংখ্যাটিকে আমরা ইংরেজির ডজন অর্থেও ব্যবহার করি।

সংখ্যাবাচক শব্দের শেষে কতকগুলি নির্দেশক শব্দও বসানো হয়। এগুলি হলো : টো, টে, টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি জাতীয় খণ্ডশব্দ। এগুলি সংখ্যাকে আরও নির্দিষ্টভাবে বোঝায়। যেমন: তিনটি, পাঁচখানা, সাতগাছি, দুটো, চারটে ইত্যাদি। এখানে আবার তরীখানা, ছেলেটি, লোকটা, দড়িগাছা — এই জাতীয় শব্দে দেখো সংখ্যার উল্লেখ না থাকলেও বোঝা যাচ্ছে যে একটিকেই কিন্তু বোঝানো হচ্ছে। আবার বন্ধুরা, গাছগুলো, পাতাগুলি — এই জাতীয় শব্দে একের বেশি বোঝাচ্ছে।

(২) ভগ্নাংশিক সংখ্যাশব্দ :

এই জাতীয় সংখ্যাবাচক শব্দগুলির মধ্যে কয়েকটি ভগ্নসংখ্যাবাচক বিশেষণ যেগুলি ভগ্নাংশ জাতীয় সংখ্যা হলেও আলাদা নাম রয়েছে।

আধ/আধা - ($\frac{১}{২}$) বোঝায়। আধলা, আধাখ্যাঁচড়া, আধখানা, আধপাগল ইত্যাদি।

সাড়ে - এক আর দুই ছাড়া নিরানব্বই পর্যন্ত সব সংখ্যার পূর্ণমান যোগ অর্ধেক বোঝাতে বিশুদ্ধ সংখ্যাশব্দের আগে এটি বিশেষণ হিসেবে বসে।

সাড়ে চারটে - চার ঘণ্টা + এক ঘণ্টার অর্ধেক ($৪\frac{১}{২}$)

সাড়ে আট টাকা - আট টাকা + এক টাকার অর্ধেক ($৮\frac{১}{২}$)

তেহাই - তিন ভাগের একভাগ ($\frac{১}{৩}$) বোঝায়। তালের মান বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

দেড় - ($১\frac{১}{২}$) বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট নামের ভগ্নাংশিক সংখ্যাশব্দ। দেড়দিন, দেড়হাতি।

আড়াই - ($২\frac{১}{২}$) বোঝাতে একটি স্বতন্ত্র নামের সংখ্যাশব্দ। আড়াই গজ, আড়াই মন।

পোওয়া/ পোয়া - ($\frac{১}{৪}$) অর্থাৎ চারভাগের একভাগ বোঝায়। পোয়াটাক দুধ, দু-পোয়া ঘি।

সিকে/সিকি - ($\frac{১}{৪}$) এই শব্দটিও চারভাগের একভাগ বোঝায়। সিকি বলতে ২৫ পয়সার মুদ্রাও ছিল, যা এক টাকার চারভাগের একাংশ । ২৫% বোঝাতেও ব্যবহার হয়। পাঁচসিকের সিন্নি মানত করা, অর্থাৎ একটাকা পঁচিশ পয়সার পুজো।

পৌনে - ($\frac{১}{৪}$) ভাগ কম বা বাকি বোঝায়। পৌনে তিনটে : তিনটে বাজতে ১৫ মিনিট ($\frac{৬০}{৪}$) বাকি।

সওয়া - ($\frac{১}{৪}$) ভাগ বেশি বা অতিরিক্ত বোঝায়। সওয়া তিনটে : তিনটে বেজে ১৫ মিনিট ($\frac{৬০}{৪}$) বেশি।

ছটাক - এক পোয়া-র চারভাগের একভাগ। এক ছটাক তেল।

এমনিতে অন্যান্য ভগ্নাংশসূচক সংখ্যাশব্দগুলির ক্ষেত্রে একের তিন, আটের পাঁচ, ছয়ের আট — এইভাবে দুটি সংখ্যার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। তার আগে পূর্ণসংখ্যা বসলে দুই পূর্ণ পাঁচের ছয় ($২\frac{৫}{৬}$) বা সাত পূর্ণ চারের নয় ($৭\ \frac{৪}{৯}$) — এভাবে উল্লেখ করা হয়।

(৩) গুণিতক সংখ্যাশব্দ :

- সংখ্যাশব্দটির শেষে - গুণ শব্দটি জুড়ে তার গুণিতককে চিহ্নিত করা হয়।

  দ্বিগুণ মজা, সাতগুণ আনন্দ, দশগুণ ভারী।

- এক্ষেত্রে অনেকসময় ইংরেজি ডবল শব্দটিও ব্যবহৃত হয়।

  ডবল খুশি, চার ডবল দাম, তিন ডবল পয়সা।

- দশ, কুড়ি সংখ্যাগুলিও অনেকক্ষেত্রে গুণিতকরূপে ব্যবহৃত হয়।

  চারকুড়ি বয়স হয়ে গেল, তিন দশ পাঁচ পঁয়তিরিশ, এক কুড়ি পান দাও।

- একই সংখ্যার দুবার উল্লেখে পরিমাণের অল্পতা বোঝায় এমন দৃষ্টান্ত পাই।

  দুটি-দুটি, চারটি-চারটি।

(৪) অনির্দেশক সংখ্যাশব্দ :

- দুটি সংখ্যাশব্দ পাশাপাশি বসিয়ে প্রয়োগ করলে নির্দিষ্ট সংখ্যা না বুঝিয়ে তা অনির্দিষ্ট বা মোটামুটি আন্দাজ কোনো সংখ্যা বোঝায়।

সাত-পাঁচ ভাবনা, দশ-বারো ফুট গভীর, সাত-আট হাজার মানুষ, আঠারো-উনিশ বছর বয়স।

- আবার সংখ্যাশব্দের সঙ্গে অন্য শব্দও বসে সেটিকে অনির্দিষ্ট করতে পারে।

পাঁচখানা নির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝালেও **খানপাঁচেক** অনির্দিষ্ট। একইভাবে **বারো বছর** কিন্তু **বছর বারো**। **দশ হাত** কিন্তু **হাতদশেক**। **বিঘে দুই, ফুটচারেক, মাইলখানেক, গোটাচারেক, জনা-তিরিশ**।

বাংলা বাগ্‌ধারায় অর্থাৎ লোকমুখে প্রচলিত বিশিষ্ট অর্থবোধক কথাতেও সংখ্যাবাচক শব্দের প্রয়োগ অন্যধরনের অর্থ প্রকাশ করে। যেমন :

একাই একশো, দশের লাঠি একের বোঝা, দু-কান কাটা, দু-মুখো সাপ, দু-নৌকায় পা দেওয়া, এককে একুশ করা, এক ঢিলে দুই পাখি মারা, দু হাত এক করা, পাঁচ কান হওয়া, চোদ্দো চাকার রথ দেখানো, চিঁড়ের বাইশ সের, সাত পুরুষ, চোদ্দো গুষ্টি।

৩. পূরণবাচক শব্দ

সংখ্যাশব্দগুলি সবই ছিল এক-একটি নাম। এই জাতীয় সংখ্যাশব্দ থেকে যখন কোনো নির্দিষ্ট স্থান বা ক্রম বোঝায়, অর্থাৎ সংখ্যাশব্দের একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তখন সেই শব্দগুলিকে পূরণবাচক শব্দ বলে।

এই জাতীয় শব্দগুলিকে **পূরণবাচক বিশেষণ, ক্রমবাচক বিশেষণ, সংখ্যাক্রমবাচক শব্দ** — এরকম নামেও অনেকে চেনেন।

- সংস্কৃত বা আর্যভাষা থেকে বাংলায় বিভিন্ন ক্রমবাচক শব্দের ব্যবহার হয়। তার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ, বিংশ, একবিংশ, দ্বাবিংশ, ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ, পঞ্চবিংশ ইত্যাদি বিভিন্ন পূরণবাচক শব্দ। এর পরবর্তী শব্দগুলি বেশিরভাগই অপ্রচলিত হয়ে গেছে।
- বাংলা মাসে কিছু তিথি ও দিনগণনার সূত্রে এমন কয়েকটি সংস্কৃত পূরণবাচক শব্দের ব্যবহার চলে। বিশেষ করে দুর্গাপুজোর সময়

দেখো পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী --- এগুলো আমরা সবাই বলি। এছাড়া দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী --- এইসব তিথিনামও পূরণবাচক।

- আগে আমরা আর্যভাষা অথবা সংস্কৃত ভাষা থেকে রূপান্তরের ফলে বাংলায় তৈরি হওয়া যেসব তদ্ভব শব্দের কথা বলেছিলাম, সেরকম অনেকগুলি তদ্ভব পূরণবাচক শব্দ আছে।

এক থেকে চার পর্যন্ত ঘরের এরকম শব্দগুলি: পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা।

পাঁচ থেকে আঠারোর পূরণবাচক শব্দ : এগুলির জন্যে সংখ্যাশব্দের শেষে -'ই' বা -'ওই' যোগ করে শব্দগুলি তৈরি করা হয়। পাঁচই, ছয়ই, সাতই, আটই, নয়ই, দশই, এগারোই, বারোই,

তেরোই, চোদ্দোই, পনেরোই, ষোলোই, সতেরোই, আঠারোই।

উনিশ থেকে একতিরিশের পূরণবাচক শব্দ : এগুলির জন্য সংখ্যাশব্দের শেষে 'এ' যোগ করা হয়। উনিশে, বিশে, একুশে, বাইশে, তেইশে, চব্বিশে, পঁচিশে, ছাব্বিশে, সাতাশে, আঠাশে, উনতিরিশে, তিরিশে, একতিরিশে।

খেয়াল করো যে ওপরের এই পূরণবাচকগুলি আমরা মাসের তারিখ বোঝাতেই ব্যবহার করি।

- সংখ্যাশব্দের শেষে 'তম' যোগ করে পূরণবাচক শব্দ তৈরি হয়। যেমন : **একাদশতম**, **পঞ্চাশত্তম**, **শততম**। এগুলি সাধারণত কোনো সংস্থা বা গোষ্ঠীর বর্ষপূর্তি বোঝাতে বা ব্যক্তির জন্মদিনের সেই নির্দিষ্ট বর্ষপূর্তি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়।

- পরিবারের একাধিক ভাইবোনের ক্ষেত্রে মেজো, সেজো, ন , রাঙা ইত্যাদি শব্দ বা দ্বিতীয় বোঝাতে দোজ (দোজবর) শব্দগুলি কিছু প্রচলিত পূরণবাচক শব্দ, যা সম্পর্ক বোঝায়।
- সংখ্যাশব্দের শেষে 'র' বা 'এর' যোগ করে সহজেই পূরণবাচক করতে আমরা অভ্যস্ত। যেমন : **পাঁচের** (পাঁচ + এর) ঘরের নামতা। বইটির **পনেরোর** (পনেরো + র) পাতায় গল্পটা দেখো।
- একইভাবে সংখ্যাশব্দের পরে কেউ কেউ ইংরেজির 'নম্বর' শব্দটাও যোগ করে পূরণবাচক বানায়। যেমন : ডানদিকে **দু-নম্বর** গলি। **এক নম্বরের** কিপটে লোক।

বইয়ের **দশ নম্বর** অধ্যায়। **দু-নম্বরি** বলতে অসৎ বোঝায়। **বারো নম্বর** রুলটানা খাতা।

এরমধ্যে আবার সংখ্যাশব্দের বদলে কখনও পূরণবাচকও জুড়ে দেওয়া হয় : **পয়লা নম্বরের** ধড়িবাজ।

- চল্লিশ থেকে **চালশে** (চোখের ছানি), **বাহাত্তুরে** (বৃদ্ধ বোঝাতে)জাতীয় কিছু প্রচলিত শব্দ আছে। **ষাটোর্ধ্ব, সত্তরোর্ধ্ব** জাতীয় শব্দগুলি ষাট, সত্তরের থেকে বেশি বোঝাতে প্রচলিত।

হাতে কলমে

১.নীচের শব্দগুলির দুটি করে অর্থ লেখার চেষ্টা করো :

পড়া, তিল, বর্ণ, বল, চিনি, মুকুর, জাতি, লক্ষ, বাঁক, কাল, নর

২.বাঁদিকের শব্দগুলির সঙ্গে ডানদিকের শব্দগুলিকে মেলাও :

দাউ দাউ	হাসি
গুম গুম	বাজ পড়া
শোঁশোঁ	কাঁচের সার্শি
ফিস ফিস	আগুন
ভন ভন	কিল মারা

হাউ হাউ	কথা বলা
খিক খিক	মাছি
থপ থপ	বাতাস বওয়া
কড় কড়	পা ফেলে চলা
ঝন ঝন	কান্না

৩.তোমার নাম আর তোমার পাঁচজন বন্ধুর নামগুলিকে ধ্বনিতে ভেঙে কটি করে স্বর ও ব্যঞ্জন রয়েছে দেখাও।

৪.নীচের শব্দগুলির মধ্যে মৌলিক শব্দ আর যৌগিক শব্দগুলিকে দুভাগে ভাগ করে সাজাও :

পণ্ডশ্রম, ঝুলন্ত, করি, সফলতা, বই, মাছ, নীচতম, বিদ্যামন্দির, ছয়, দাদা, দেখি

৫.উপযুক্ত সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক শব্দ উল্লেখ করে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৫.১ _____ সমুদ্র _____ নদী।

৫.২ হাতের _____ আঙুল সমান হয় না ।

৫.৩ সপ্তাহে _____ দিন।

৫.৪ শ্রাবণ হলো বছরের _____ মাস।

৫.৫ ষষ্ঠ শ্রেণিতে _____ স্থান পেয়েছে।

৫.৬ _____ ভাই চম্পা আর _____ বোন পারুল।

৫.৭ অরুণ, বরুণ, কিরণমালা _____ ভাইবোন।

৫.৮ _____ শ্রেণির শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা।

৫.৯ _____ পঞ্চাশের সঙ্গে এক যোগ করলে হয় _____।

৫.১০ আমার বয়স এখন _____ বছর, _____ শ্রেণিতে পড়ি।

৬.নীচের বাক্যগুলিতে কী জাতীয় সংখ্যাবাচক বা পূরণবাচক শব্দ ব্যবহার হয়েছে তা লেখো :

৬.১ বিকেল সাড়ে চারটের মধ্যে প্রেস থেকে দেড়শো বই নিয়ে এসো।

৬.২ রজত জয়ন্তী পালন করতে সাত মাথার মোড় থেকে ভোর পৌনে ছটায় প্রভাতফেরী বার হবে।

৬.৩ আড়াই কিলো ময়দায় দুপোয়া ঘি মেখে এক লিটার জল দিয়ে আধ ঘণ্টা রেখে

লেচি পাকিয়ে প্রয়োজন মতো দুটো চারটে করে লুচি ভাজুন যাতে জনা চল্লিশ লোক পেটপুরে খেতে পারে।

৬.৪ পয়লা বৈশাখ থেকে ষাটোর্ধ্ব মানুষেরা বছরে দুবার বিনাখরচে স্বাস্থ্যপরীক্ষা করাতে পারবেন।

৬.৫ মেজোকাকার পঞ্চাশতম জন্মদিন তেরোই অক্টোবর পালিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শব্দরূপ, বিভক্তি, অনুসর্গ ও উপসর্গ

১. শব্দরূপ

আগের অধ্যায়ে আমরা দেখেছিলাম শব্দগুলি অর্থযুক্ত কিছু ধ্বনি বা ধ্বনির সমষ্টি। আমরা কথা বলার সময় বা লেখার সময় বাক্য তৈরি করি। এই বাক্যগুলি তৈরি করতে আমাদের শব্দ জুড়ে জুড়ে ব্যবহার করতে হয়।

সুরঞ্জনা ভালো মেয়ে।

ওপরে একটা বাক্য তৈরি হয়েছে তিনটে শব্দ দিয়ে। 'মেয়ে', 'ভালো' বা 'সুরঞ্জনা' এগুলো সেই

বাক্যের তিনটে শব্দ। দেখে মনে হচ্ছে শব্দগুলো জুড়ে দিলেই বাক্য হয়ে গেল। কিন্তু এভাবে সব বাক্য তৈরি করা যাবে না। যেমন,

সুরঞ্জনার বইতে কবিতাগুলি বেশ ভালো।

এবারে তাহলে শুধু শব্দ জুড়ে বাক্য হচ্ছে না। সুরঞ্জনা(-র) বই (-তে) কবিতা (-গুলি) এইভাবে শব্দের শেষে -র /-তে/-গুলি এমন সব খণ্ড বা শব্দাংশ যোগ করতে হলো। তখন এই শব্দগুলি আর শুধুই শব্দ না থেকে একটু অন্য ধরনের শব্দ হলো। **বাক্যের মধ্যে যখন শব্দগুলি এভাবে একটু বদলে গিয়ে বসে, আবার কখনো কখনো না বদলেও বসে, তখন সেগুলিকে বলে পদ।**

যে শব্দগুলো বদলায়নি, যেমন 'বেশ' আর 'ভালো'—সেগুলিকে যদি কোনো অভিধানে দেখতাম তাহলে বলতাম **শব্দ**। কিন্তু বাক্যটার

অংশ হিসেবে যখন দেখছি তখন সেগুলিরও নাম **পদ**। তার মানে কিছু পদ আছে যেগুলিকে দেখে মনে হচ্ছে শব্দই দেখছি। আর কিছু পদ আছে যেগুলিকে দেখে বুঝতে পারছি শব্দের সঙ্গে কিছু জুড়ে সেটা অন্যরকম হয়েছে। যে জিনিসগুলো শব্দের সঙ্গে জুড়েছে সেগুলির নাম হলো **বিভক্তি**। যে বিভক্তি জুড়লে শব্দের চেহারায় বা উচ্চারণে কোনো বদল হয় না, অথচ শব্দটা বাক্যে ব্যবহারের উপযুক্ত পদ হতে পারে, সেগুলিকে **শূন্য বিভক্তি** বলে। এগুলি অদৃশ্য, কিন্তু আছে। 'ভালো'/ 'বেশ' শব্দ দুটোর শেষে কিছু নেই যেমন বলতে পারি, আবার '০' শূন্য আছে এভাবেও বলতে পারি।

তাই বলা হয় :

(শব্দ) ভালো + ০ বিভক্তি = ভালো (পদ)

(শব্দ) বেশ + ০ বিভক্তি = বেশ (পদ)

শূন্য বিভক্তি জিনিসটা কেমন সহজ। বাক্যের মধ্যে যে কটা শব্দের শেষে কিছুই জোড়েনি সেগুলিই তাহলে শূন্য বিভক্তিওয়ালা পদ।

এবার দেখতে হবে যখন কিছু জুড়ছে, সেগুলি কীভাবে জোড়ে আর কী কী জোড়ে? বাক্যে পদগুলির ব্যবহার অনুযায়ী দুটো ধরন দেখা যায়। কিছু পদ কাজ বোঝায় আর বাকি পদগুলি নাম, সংখ্যা, সময়, গুণ বা বৈশিষ্ট্য বোঝায়। দু-ধরনের পদগুলি তৈরি হবার সময় দু-ধরনের বিভক্তির ব্যবহার হয়। কাজ বা ক্রিয়া বোঝায় এমন মূল বা সার শব্দরূপকে বলে **ধাতু** যেগুলি '√' চিহ্নের সাহায্যে আমরা আগের অধ্যায়ে বুঝেছি। (দেখে নাও 'সাধিত' শব্দের গঠন)। অন্য পদগুলির মূল বা সার হলো **শব্দ**।

● ধাতু-র সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত হয় সেগুলিকে বলে **ধাতুবিভক্তি**। এভাবে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়।

- শব্দ-র সঙ্গে যে বিভক্তি যুক্ত হয়, সেগুলিকে বলে **শব্দবিভক্তি**। এভাবে ক্রিয়া ছাড়া অন্য পদ তৈরি হয়।

এই অধ্যায়ে আমরা শব্দ-বিভক্তিগুলিকে চিনব। পরের অধ্যায়ে ধাতুবিভক্তি আর ক্রিয়াপদ।

২. শব্দরূপ ও শব্দবিভক্তি জুড়ে পদ গঠন

যেসব বর্ণ বা বর্ণসমষ্টি মূল শব্দরূপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যের অন্য পদগুলির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সেই শব্দকে পদে রূপান্তরিত করে, সেগুলিই শব্দবিভক্তি।

এগুলির দ্বারা শব্দটির সংখ্যাগত পরিচয় (এক বা বহু), বাক্যে অবস্থিত পরবর্তী বা দূরবর্তী পদের সঙ্গে সম্পর্কও বোঝা যায়।

[কারক অনুযায়ী শব্দবিভক্তিগুলিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুসরণে আগে বাংলাতেও প্রথমা,

দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী—এইসব নাম দেওয়া হতো।]

শব্দবিভক্তিগুলি যখন একজন, একটি বস্তু বা প্রাণী, এরকম কিছু বোঝায়, সেরকম যে কটি রূপ আছে, সেগুলি হলো: -এ, -তে, -র, -কে, -রে, -এর, -য়, শূন্য বিভক্তি

গাছ + এ = গাছে, বাড়ি + তে = বাড়িতে, দাদা + র =দাদার, ভিখারি + কে = ভিখারিকে, পাখিটি + রে = পাখিটিরে, দল + এর = দলের, কলকাতা+ য় = কলকাতায়, তুমি + ০ = তুমি। আমি, তুমি, সে, উনি, তিনি, তুই, আপনি—এই

শব্দগুলির সঙেগ শব্দবিভক্তি জুড়লে দেখো মূল শব্দগুলিরও চেহারা কেমন বদলে যায়। যেমন:

আমি + র = আমার,

আমি + কে = আমাকে, আমি + য়= আমায়

তুমি + রে = তোমারে, তুমি + য় = তোমায়,

তুমি + কে = তোমাকে

সে + র= তার, সে + কে = তাকে,

সে + য় = তায়

উনি + কে= ওনাকে, উনি + র = ওনার,

উনি + রে = ওনারে

তিনি + র= তাঁর, তিনি + কে = তাঁকে,

তিনি + রে = তাঁরে

[তেনার, তেনাকে, তেনারও হয়]

তুই + র = তোর, তুই + কে = তোকে,

তুই + তে = তোতে

আপনি + র = আপনার,

আপনি + রে = আপনারে,

আপনি + কে = আপনাকে

একমাত্র ‘ও’ শব্দটি এভাবে বদলায় না বলে ওর, ওকে, ওতে, ওরে এই রূপগুলি পাওয়া যায়।

শব্দবিভক্তিগুলি একের বেশি ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী বা ভাব বোঝালে তার রূপ অন্যরকম হয়। সেগুলি হলো :

-রা, -এরা, -গুলি, -গুলো, -গণ, -দের, -দিগ

দেবতা + রা = দেবতারা,

মানুষ + এরা = মানুষেরা,

সন্দেশ + গুলি = সন্দেশগুলি,

হরিণ + গুলো = হরিণগুলো,

ব্রাহ্মণ + গণ = ব্রাহ্মণগণ,

বাবু + দের = বাবুদের,

বালিকা + দিগ = বালিকাদিগ

আমি, তুমি, সে জাতীয় শব্দগুলির ক্ষেত্রে আবারও আগেরবারের মতোই বদলানো রূপ দেখা যাবে। যেমন :

আমি + রা = আমরা

আমি + দের/দিগ = আমাদের /আমাদিগ

তুমি + রা = তোমরা

তুমি + দের/ দিগ = তোমাদের/তোমাদিগ

সে + রা = তারা

সে + দের / দিগ = তাদের / তাহাদিগ

ও + রা = ওরা

ও + দের / দিগ = ওদের / উহাদিগ

উনি + রা = ওনারা/ওঁরা

উনি + দের/ দিগ = ওনাদের / ওনাদিগ

তিনি + রা = তেনারা / তাঁরা

তিনি + দের/দিগ = তেনাদের / তাঁহাদিগ

তুই + রা = তোরা তুই + দের = তোদের

আপনি + রা = আপনারা

আপনি + দের/দিগ = আপনাদের/আপনাদিগ

অনেক সময় দেখা যায় যে শব্দের সঙ্গে একটা শব্দবিভক্তি জোড়ার পরেও আরও একটা শব্দবিভক্তি না জুড়লে অর্থ পরিস্ফুট হচ্ছে না। তখন দ্বিতীয় বিভক্তিও জুড়তে হয়। যেমন :

বালকদিগকে ফুল দাও। (দিগ + কে)

মানুষগুলির মনে খুব আনন্দ। (গুলি + র)

গোরুগুলোর গলায় ঘণ্টা বাজাছে। (গুলো + র)

ফলগুলোতে পোকা লেগেছে। (গুলো + তে)

৩. অনুসর্গ

বাক্যে ব্যবহার করতে হলে শব্দগুলো শব্দবিভক্তি জুড়ে পদ হয়। তবুও অনেকসময় দেখা যায় যে বাক্যের অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতে সেই শব্দবিভক্তি জোড়াটাও যথেষ্ট হচ্ছে না।

দুর্গামূর্তির **মুখের দিকে** ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে।

হাত দিয়ে দাবা খেল আর **পা দিয়ে ফুটবল**?

ওই **মেয়েটির কাছে,** সন্ধ্যাতারা আছে।

কেন চেয়ে আছ গো মা, **মুখপানে**?

খাবারের **দাম বাবদ** খুব বেশি দিতে হলো না।

এই কটা মাত্র **টাকা বই** তো নয়!

এই বাক্যগুলিতে দিকে, দিয়ে, কাছে, পানে, বাবদ, বই—এই যে শব্দগুলো বসেছে সেগুলোর সঙ্গে তার ঠিক আগের শব্দগুলোর প্রত্যক্ষ যোগ আছে।

এমনিতে আলাদা পদ হিসেবে এগুলোর গুরুত্ব নেই যদি না আগের শব্দবিভক্তিযুক্ত পদগুলির সঙ্গে এরা বসে। এরাও ঠিক সেই ধরনের কাজই করছে, শব্দবিভক্তিগুলি যেমন কাজ করত। এগুলিকেই **অনুসর্গ** বা শব্দের পরে বসে বলে **পরসর্গ** (ইংরেজিতে post position) বলে।

বিভক্তি আর অনুসর্গ দুটোই সম্পর্কযুক্ত শব্দ বা পদের পরে বসে; দুইয়ের কাজও অনেকটা একই রকম। কিন্তু বিভক্তি হলো ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ জাতীয় শব্দখণ্ড, আর অনুসর্গ হলো সম্পূর্ণ এক একটি শব্দ।

আগের শব্দবিভক্তি নিয়ে আলোচনায় আমরা দেখেছিলাম যে, বাংলায় শব্দবিভক্তির সংখ্যা খুব বেশি নয়। **তাই বিভক্তিযুক্ত পদের পরে বা বিভক্তির বদলে সম্পর্কযুক্ত পদটির পরে যে শব্দগুলি বসে বিভক্তিরই মতো কাজ করে**

(অর্থাৎ অন্য পদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে) সেগুলিকে অনুসর্গ বলে। অনু (পশ্চাৎ) সর্গ নাম থেকেই বোঝা যায় এগুলি পরে বসবে।

- অনুসর্গের আরো কয়েকটি প্রচলিত নাম আছে: **পরসর্গ, সম্বন্ধীয়, কর্মপ্রবচনীয়**।
- বৈয়াকরণ অনুসর্গগুলিকে অব্যয় জাতীয় পদ বলতে চেয়েছেন। কারণ তাঁদের মতে অনুসর্গ শব্দগুলির যে চেহারা বা রূপ, তার সঙ্গে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ জুড়তে পারে না। তাই অনুসর্গগুলির রূপ অটুট থাকে। কিন্তু দেখো : মানুষের **সঙ্গেই** মানুষের বিবাদ হয়। উহাদের **সহিতই মিশিবে না।**

নদীর **পাশেই** ঘনবসতি। কিছুক্ষণের **মধ্যেই** অনুষ্ঠান শুরু হবে।

তোমার ভুলের **জন্যই** সর্বনাশটা হলো। মনের **ভিতরে** কী আছে কে জানে?

তাহলে সঙ্গে, পাশে, মধ্যে এরকম অনুসর্গগুলির পরেও কিন্তু শব্দবিভক্তি লাগানো যাচ্ছে।

● বিভক্তিগুলির যেমন দুটো ভাগ : **শব্দবিভক্তি ও ধাতুবিভক্তি**

অনুসর্গগুলিরও তেমন দুটো রূপ : **শব্দজাত অনুসর্গ ও ধাতুজাত অনুসর্গ**

এই অধ্যায়ে আমরা শব্দজাত অনুসর্গগুলোকে কেবল চিনব। পরের অধ্যায়ে রইল ধাতুজাত অনুসর্গ।

৩.১ শব্দজাত অনুসর্গ

শব্দজাত অনুসর্গগুলিকে কেউ **নাম অনুসর্গ** বা কেউ **বিশেষ্য অনুসর্গ**ও বলে থাকেন। বাংলায় এই অনুসর্গগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়।

(১) সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ

(২) বিবর্তিত, রূপান্তরিত বা তদ্ভব অনুসর্গ (+ দেশি অনুসর্গ)

(৩) বিদেশি অনুসর্গ

(১) সংস্কৃত বা তৎসম অনুসর্গ

এই অনুসর্গগুলি সংস্কৃত ভাষা থেকে পাওয়া। এর মধ্যে কতগুলি কেবল বাংলা সাধুভাষাতেই ব্যবহার হয়, চলিত বাংলা ভাষায় এগুলির ব্যবহার নেই।

১. **দ্বারা** : তোমার **দ্বারা** কিছুই হবে না।

২. **কর্তৃক** : বঙ্কিমচন্দ্র **কর্তৃক** এইসব শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছিল।

৩. **ব্যতীত** : জল **ব্যতীত** মাছের জীবন অসম্ভব।

৪. **দিকে** : ঘড়ির **দিকে** তাকিয়ে বসে আছি।

৫. **ন্যায় :** গোপাল ভাঁড়ের **ন্যায়** রসিক কটি আছে?

৬. **নিমিত্ত :** বিশ্রামের **নিমিত্ত** এই কক্ষটি নির্মিত।

৭. **পশ্চাতে :** মরীচিকার **পশ্চাতে** ছুটলে মৃত্যুই পরিণতি।

৮. **সমীপ :** প্রহরী রাজার **সমীপে** চোরটিকে পেশ করল।

৯. **অভিমুখে :** নদীগুলি যায় সাগরের **অভিমুখে।**

১০. **মধ্যে :** বাংলায় দশের **মধ্যে** দশ পেয়েছে।

এগুলি ছাড়াও এই শাখাটিতে অন্য অনুসর্গগুলি হলো : **অপেক্ষা, উপরে, কারণে, জন্য, নিকট,**

প্রতি, সঙ্গে, সম্মুখে, সহিত, নীচে, অন্তরে, অবধি।

(২) বিবর্তিত, রূপান্তরিত বা তদ্ভব অনুসর্গ এবং দেশি অনুসর্গ

তদ্ভব শব্দের মতো এই অনুসর্গগুলি সংস্কৃত থেকে রূপান্তরিত বা বিবর্তিত হয়ে তৈরি হয়েছে।

১. **বিনা** : শিক্ষা **বিনা** গতি নাই।

২. **তরে** : কীসের **তরে** এত আক্ষেপ?

৩. **মাঝে** : এ কলকাতার **মাঝে** আরেকটা কলকাতা আছে।

৪. **সঙ্গে** : ফুলটির **সঙ্গে** ভ্রমরের বন্ধুত্ব।

৫. **ছাড়া** : এই বৃষ্টিতে ছাতা **ছাড়া** বার হওয়া অসম্ভব।

৬. **আগে** : সবার **আগে** প্রয়োজন দেশের উন্নতি।

৭. **পাশে :** গরিবদের **পাশে** না দাঁড়ালে মানুষই নও।

৮. **কাছে :** তোমার **কাছে** যে কলম আছে, আমার **কাছেও** সে কলমই আছে।

৯. **সুদ্ধ :** বাচ্চাগুলোর উৎসাহ বড়োদের **সুদ্ধ** মাতিয়ে তুলেছে।

১০. **বই :** মানুষটা ঢের পড়াশোনা করে **বই** কি।

এই দশটি ছাড়াও এই ধারার অন্য অনুসর্গগুলি হলো : **সামনে, ভিতর, আশে, পানে। এর মধ্যে তরে, সাথে, মাঝে, পানে**—এই অনুসর্গগুলি শুধু কবিতাতেই ব্যবহার করা হয়।

(৩) বিদেশি অনুসর্গ

এই অনুসর্গগুলির মধ্যে প্রথম চারটি ফারসি ভাষা থেকে এবং পরের দুটি আরবি ভাষা থেকে বাংলায় গ্রহণ করা হয়েছে।

১. **বরাবর** : এই সোজা রাস্তায় নাক **বরাবর** চললেই পৌঁছে যাবে।

২. **বনাম** : মোহনবাগান **বনাম** ইস্টবেঙ্গলের খেলায় বরাবরই প্রচুর দর্শক হয়।

৩. **দরুন** : ঠান্ডার **দরুন** অবস্থা বেশ করুণ!

৪. **বাদে** : আর কিছুক্ষণ **বাদে** নাটকটা শুরু হবে।

৫. **বাবদ** : সামান্য এই কটা জিনিসের দাম **বাবদ** এতগুলি টাকা গচ্চা গেল!

৬. **বদলে** : নাকের **বদলে** নরুন পেলাম, টাক ডুমাডুমডুম!

৪. উপসর্গ

আগের অধ্যায়ে আমরা শব্দের সঙ্গে শব্দাংশ আর ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে কেমনভাবে সাধিত শব্দগুলি তৈরি হয় তার গঠন সম্বন্ধে জেনে গেছি। এই অধ্যায়ে দেখলাম তারও পরে জোড়া হচ্ছে বিভক্তি এবং সেটাও যথেষ্ট না হলে তারপর জুড়েছি অনুসর্গগুলি। সুতরাং এগুলি সবই ছিল শব্দের ডানদিকে অর্থাৎ শব্দের পরে কিছু না কিছু শব্দখণ্ড বা গোটা গোটা শব্দ যোগ করা। এবার ভাবব উলটোটা। তার মানে, শব্দের বাঁদিকে অর্থাৎ শব্দের আগে কিছু জোড়া হচ্ছে কিনা।

প্রথমে কয়েকটা এমন শব্দ নেওয়া যাক যেগুলি কীভাবে গঠিত হয় তা আমরা এর মধ্যে জেনে গেছি। এরকম কয়েকটা শব্দ হলো: বেলা, বৃষ্টি, ডাল, নজর, ছাগল, পেট।

এবার এগুলির প্রত্যেকটির বাঁদিকে একটা করে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যোগ করে দেখব।

(অ) বেলা = অবেলা

(অনা) বৃষ্টি = অনাবৃষ্টি

(আব) ডাল = আবডাল,

(মগ) ডাল = মগডাল

(কু) নজর = কুনজর

(রাম) ছাগল = রামছাগল

(ভর) পেট = ভরপেট

এই বাঁদিকে অর্থাৎ শব্দের আগে যুক্ত (অ-, অনা-, আব-, কু-, রাম-, ভর-) অংশগুলিকে বা শব্দখণ্ডগুলিকে বলা হয় উপসর্গ। ইংরেজি ভাষায় Prefix কথাটা যেমন বোঝায় আগে সংযুক্ত উপাদান, বাংলায় উপসর্গও ঠিক তাই। শব্দগুলি যা ছিল, আর উপসর্গ লাগানোর পর যা হয়েছে, তাতে করে দেখো অনেকক্ষেত্রে অর্থও বদলে গেছে।

তাহলে **উপসর্গ হলো সেইসব বর্ণ বা বর্ণচিহ্ন যেগুলি শব্দের আগে সংযুক্ত হয়ে শব্দটির অর্থকে আংশিকভাবে বা পুরোপুরি বদলে দিয়ে থাকে**। উপসর্গগুলিকে অন্য নামে ডাকা হয়। সেই নামটি হলো **আদ্যপ্রত্যয়**। উপসর্গগুলি শব্দের বিপরীতার্থক শব্দ তৈরি করে, কখনো শব্দের নির্দিষ্ট অর্থের ব্যাপ্তিও বোঝায়, আবার কখনো শব্দের অর্থকে সংকুচিতও করে। একটিই উপসর্গ অনেকরকম অর্থের তাৎপর্যও বোঝায়।

বাংলায় উপসর্গগুলিরও কয়েকটি শ্রেণি রয়েছে।

(১) বাংলার নিজস্ব উপসর্গ

(২) সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপসর্গ

(৩) বিদেশি উপসর্গ

এবারে এই উপসর্গগুলিকে চিনে নেব। প্রত্যেকটার উদাহরণ আর অর্থেরও উল্লেখ করব।

৪.১ বাংলা উপসর্গ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অ -	অনড়, অমিল, অকেজো, অবেলা, অধর্ম, অকর্মা, অকথ্য	না-সূচক, খারাপ
অজ -	অজপাড়াগাঁ, অজমূর্খ	নিতান্ত
অনা -	অনাহার, অনাবৃষ্টি, অনাচার, অনাসৃষ্টি, অনামুখো	না-সূচক, মন্দতা
* আ -	আছোলা, আচমকা, আগাছা, আঘাটা, আকাল, আকথা, আলুনি	না-সূচক, অপকর্ষতা

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
আড় -	আড়চোখ, আড়মোড়া	বাঁকা, অর্ধেক
আন -	আনকোরা, আনমনা, আনচান	না-সূচক, বিক্ষিপ্ত
আব -	আবছায়া, আবডাল	অস্পষ্টতা
কু -	কুকথা, কুকাজ, কুনজর, কুলক্ষণ, কুডাক, কুচক্র	খারাপ
* নি -	নিপাট, নিখরচা, নিখাদ	না-সূচক
না -	নাহোক, নাবালিকা, নামঞ্জুর	না-সূচক

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
স -	সজোর, সপাট, সটান, সখেদ	সঙ্গে
ভর -	ভরসন্ধে, ভরপেট, ভরদুপুর	পূর্ণতা
পাতি -	পাতিহাঁস, পাতিকাক, পাতিলেবু, পাতকুয়ো, পাতিপুকুর	ছোটো
রাম -	রামদা, রামগবেট, রামছাগল	বড়ো
গণ্ড -	গণ্ডগ্রাম	বড়ো
হা -	হাভাতে, হাপিত্যেশ, হাঘরে, হাপুস	অভাব

৪.২ সংস্কৃত থেকে গৃহীত উপসর্গ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
প্র -	প্রদান, প্রসাদ, প্রশংসা, প্রচার, প্রবল, প্রলাপ, প্রবর্তন, প্রদোষ, প্রতারণা, প্রয়াণ	উৎকর্ষ, আধিক্য
পরা -	পরাজয়, পরাভব, পরাকাষ্ঠা, পরামর্শ, পরায়ণ, পরাক্রান্ত	বৈপরীত্য, আতিশয্য
অপ -	অপকর্ম, অপকৃষ্ট, অপহরণ, অপসারণ, অপদেবতা, অপসংস্কৃতি, অপমান, অপচয়	বৈপরীত্য, নিন্দা

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
সম্ -	সমর্থন, সম্পূর্ণ, সম্মান, সন্তর্পণ, সম্মিলন, সংযোগ, সংবাদ, সংকলন, সম্প্রীতি, সম্মুখ	সন্নিবেশ, সম্যক, আতিশয্য
* নি -	নিবিষ্ট, নিয়োগ, নিগূঢ়, নিক্ষেপ, নিদান, নিদারুণ, নিকৃষ্ট, নিগ্রহ, নিপাত, নিবারণ	সম্যক, আতিশয্য, নিন্দা
অব -	অবনতি, অবক্ষয়, অবজ্ঞা, অবমাননা, অবস্থান, অবরোধ, অবকাশ, অবসর	অধোগামিতা, বিরতি, মন্দভাব

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অনু -	অনুসরণ, অনুকরণ, অনুশীলন, অনুকূল, অনুতাপ অনুদান, অনুপ্রবেশ, অনুকম্পা, অনুদিন, অনুক্ষণ	পরে, পৌনপুনিকতা, অভিমুখী
নির্ -	নির্দোষ, নির্লোভ, নির্বোধ, নিঃস্বার্থ, নিশ্চয়, নির্ণয়, নির্গমন, নিঃসরণ	অভাব, নিশ্চয়, বহির্মুখিতা
দুর্ -	দুর্ভিক্ষ, দুষ্প্রাপ্য, দুর্ভাগ্য, দুশ্চিন্তা, দুর্গম, দুরূহ, দুর্মূল্য, দুঃসময়	অভাব, মন্দ, ক্লেশ

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
বি -	বিপদ, বিপক্ষ, বিকৃতি, ব্যারাম, বিজয়, বিজ্ঞান, বিতৃষ্ণা, বিস্তার, বিখ্যাত	বৈপরীত্য, সম্যক, অভাব
অধি -	অধীশ্বর, অধিপতি, অধিকার, অধিবাসী	প্রাধান্য, ব্যাপ্তি
সু -	সুসিদ্ধ, সুতীব্র, সুসংবাদ, সুগম, সুলভ, সুতীক্ষ্ণ, সুদূর	ভালো, সহজ, আতিশয্যআতিশয্য

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
উৎ -	উন্নতি, উদ্‌বোধন, উত্তোলন, উৎকৃষ্ট, উচ্ছেদ, উৎপীড়ন, উচ্চারণ, উৎপাদন, উদ্ভিদ	উপরের দিক, আতিশয্য
পরি -	পরিপূর্ণ, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, পরিতাপ, পরিক্রমা, পরিবৃত, পরিভ্রমণ, পরিত্যাগ	চতুর্দিক, সম্পূর্ণতা
প্রতি -	প্রতিধ্বনি, প্রতিহিংসা, প্রতিক্রিয়া, প্রতিবেশী, প্রতিষ্ঠা, প্রতিকৃতি, প্রতিকূল, প্রতিবিম্ব, প্রতিমা, প্রতিকার, প্রতিপক্ষ	বৈপরীত্য, সাদৃশ্য

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
অভি -	অভিমান, অভিসার, অভিমুখ, অভিষেক, অভিনন্দন, অভিনিবেশ, অভিযান	সম্যক, সম্মুখ
অতি -	অতিরঞ্জন, অতিলৌকিক, অতিপ্রাকৃত, অত্যুক্তি, অত্যাচার, অত্যধিক, অতিরিক্ত	আতিশয্য
অপি -	অপিব, অপিনিহিতি	অতিরিক্ত

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
উপ -	উপকার, উপহার, উপশম, উপভোগ, উপকথা, উপভাষা, উপগ্রহ, উপনদী, উপকূল, উপকণ্ঠ	সামীপ্য, অপ্রধান
* আ -	আনত, আনম্র, আভাস, আবেগ, আকাঙ্ক্ষা, আগমন, আজীবন, আমরণ, আবাসন, আকীর্ণ, আসমুদ্রহিমাচল, আপাদমস্তক, আবালবৃদ্ধবনিতা	পর্যন্ত, সম্যক, ব্যাপ্তি

৪.৩ বিদেশি উপসর্গ (ফারসি, আরবি ও ইংরেজি)

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
খোশ - (ফা)	খোশমেজাজ, খোশখবর, খোশগল্প	আনন্দদায়ক
কার - (ফা)	কারখানা, কারচুপি, কারবার, কারসাজি	কাজ
দর - (ফা)	দরদালান, দরকচা, দরপাট্টা, দরপত্তনি	নিম্নস্থ
না - (ফা)	নারাজ, নাচার, নাপাক, নালায়েক	নয়
ফি - (ফা)	ফিহপ্তা, ফিবছর, ফিরোজ	প্রত্যেক

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
ব - (ফা)	বমাল, বকলম	সঙ্গে
বে - (ফা)	বেওয়ারিশ, বেহুঁশ, বেআদব, বেমক্কা, বেচাল, বেআক্কেল, বেবাক, বেঘোর, বেপাত্তা	নিন্দাসূচক, ভিন্ন
বদ - (ফা)	বদরাগি, বদনাম, বদখেয়াল, বদমেজাজ, বদতমিজ, বদমাইশ, বদহজম	খারাপ, উগ্র
নিম - (ফা)	নিমরাজি	অর্ধেক

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
হর - (ফা)	হরদিন, হররোজ, হরবোলা, হরবখত, হরকিসিম, হরেকরকম	প্রত্যেক
আম - (আ)	আমজনতা, আমদরবার, আমসড়ক	সার্বজনীন, নির্বিশেষ
খাস - (আ)	খাসজমি, খাসকামরা, খাসদখল, খাসমহল, খাসখবর	ব্যক্তিগত, বিশেষ
গর - (আ)	গরহাজির, গররাজি, গরঠিকানা, গরমিল	নয়

উপসর্গ	শব্দ গঠন	অর্থের ভাব
লা - (আ)	লাপাত্তা, লাখেরাজ	নয়
ফুল - (ইং)	ফুলবাবু, ফুলপ্যান্ট, ফুলহাতা	পুরো
হাফ - (ইং)	হাফটিকিট, হাফহাতা, হাফনেতা, হাফমোজা, হাফআখড়াই, হাফথালা	অর্ধেক
হেড - (ইং)	হেডআপিস, হেড মিস্ত্রি, হেডপণ্ডিত, হেডস্যার, হেড দিদিমণি	প্রধান

* নি-আর * আ-এই দুটো উপসর্গ বাংলা উপসর্গের সঙ্গে সংস্কৃত থেকে নেওয়া উপসর্গের দুটি তালিকাতেই আছে। সেখানে সংস্কৃত তালিকার শব্দগুলো পুরোনো বা তৎসম; কিন্তু বাংলা তালিকার শব্দগুলো তদ্ভব বা দেশজ শব্দ।

একই উপসর্গের পরে শব্দ বসিয়ে আমরা দেখলাম যে, বাংলায় এরকম কত শব্দ তৈরি হয়েছে। এবার একটা উলটো পরীক্ষা করো। একই শব্দের আগে নানারকম উপসর্গ বসিয়ে দেখো, কত বিভিন্ন অর্থের শব্দ তৈরি হচ্ছে। যেমন —

- আহার, বিহার, প্রহার, পরিহার, উপহার, অনাহার।
- প্রকৃতি, আকৃতি, বিকৃতি, সুকৃতি, নিষ্কৃতি, অনুকৃতি, দুষ্কৃতি, প্রতিকৃতি

- আগত, প্রগত, বিগত, পরাগত, সংগত, নির্গত, অবগত, অনুগত, দুর্গত, অধিগত
- বিনত, প্রণত, পরিণত, অবনত, আনত
- আবাদ, প্রবাদ, অপবাদ, সংবাদ, অনুবাদ, বিবাদ, সুবাদ, পরিবাদ, প্রতিবাদ

আগের শব্দগুলির প্রায় সবই সংস্কৃত উপসর্গ সংযুক্ত করেই তৈরি হয়েছে। বাংলা বা বিদেশি উপসর্গ দিয়ে এত বেশি শব্দরূপ পাওয়া সম্ভব নয়।

সবশেষে আমরা সবকটি বিভাগ থেকেই কিছু কিছু উপসর্গযুক্ত শব্দ বাক্যে কেমনভাবে প্রয়োগ করা হয় তা দেখব।

অ : **অকেজো** লোকগুলি এক একটা **অকর্মার** ঢেঁকি!

আড় : দুজনেই **আড়চোখে** দুজনকে দেখছে আর **আড়মোড়া** ভাঙছে, তবু বিছানা ছাড়ছে না।

ভর : সারাদিন কিছু না খেয়ে এখন **ভরসন্ধ্যায়** এমনভাবে কেউ **ভরপেট** খায়!

পাতি : **পাতিপুকুরের** ঘোলা জল থেকে **পাতিহাঁস**গুলি মাছ ধরে খাচ্ছে।

হা : বন্যায় সব ভেসে গিয়ে **হাঘরে** লোকটি **হাভাতের** মতো একটু খাবারের আশায় **হাপিত্যেশ** করে বসে আছে।

অবেলায় লোকগুলি **পাতকুয়োর** জল খেয়ে **রামদা** নিয়ে **আগাছা** কেটে **ভরপেট** খাবার খাবে।

উপরের বাক্যটায় দেখো : পাঁচটা বাংলা উপসর্গজাত শব্দ একই বাক্যে ব্যবহার হয়েছে। তার আগের পাঁচটা উপসর্গও বাংলার নিজস্ব

উপসর্গ। এবার দেখব সংস্কৃত উপসর্গের দ্বারা তৈরি বাংলা শব্দের বাক্যে প্রয়োগ।

পরা : ওনার **পরামর্শ** অনুযায়ী খেললে **পরাজয়** অনিবার্য।

অপ : এতগুলো টাকা বছর বছর **অপসংস্কৃতির** পিছনে **অপব্যয়** করছ?

অনু : কেবলই **অনুকরণ** করে চললে একদিন **অনুতাপ** করতে হবে।

দুর: **দুর্ভিক্ষের** দিনগুলিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস **দুর্মূল্য** হবার পরও **দুষ্প্রাপ্য** ছিল।

উপ : **উপকার** করলে কি কেউ **উপহার** প্রত্যাশা করে?

আসমুদ্রহিমাচল যার **অধিকারে** ছিল তিনি দেশের **উন্নতির** জন্য **সম্প্রীতির** বার্তা **প্রতিবেশী**_দেশগুলিতে ছড়িয়ে দিয়ে সবার **প্রশংসা** পেলেন।

এবারে সংস্কৃত উপসর্গযুক্ত ছটা শব্দ একই বাক্যে দেখা গেল। সবশেষে বিদেশি উপসর্গের পালা।

ফি : **ফি-বছর** ওরা শীতকালে পিকনিক করে; **ফি-হপ্তাতে** বেড়াতে যায়।

বদ: খাবার **বদহজম** হলে লোক কি **বদমেজাজি** হয়ে যায়?

গর : অনেক লোক **গরহাজির** থাকায় হিসেবে **গরমিল** হয়ে গেল।

বে : **বেআক্কেলে** ছেলেটা **বেহুঁশ** হয়ে ফুটপাথে ঘুমোচ্ছে।

হেড : **হেডআপিসের** বন্ধ পাখাটা সারাতে **হেডমিস্ত্রির** ডাক পড়ল।

বেওয়ারিশ বাড়ির বাসিন্দা যে ছেলেটা ভালো হরবোলার ডাক ডাকত, **খাসজমির** দখল নিয়ে দু-দলের মারামারির মাঝে পড়ে বেচারা **বেঘোরে** প্রাণ হারাল।

এই বাক্যে তাহলে চারটে বিদেশি উপসর্গযুক্ত শব্দ রয়েছে।

মোট যা শিখলাম এবার সবটাকে যদি জড়ো করে সাজাও, তাহলে এমন একটা জিনিস পাওয়া যাবে :

উপসর্গ	+	শব্দ	+	বিভক্তি	=	পদ	+	অনুসর্গ
↓		↓		↓		↓		↓
প্রতি		যোগী		-র	=	প্রতিযোগীর		দ্বারা

হা
তে
ক
ল
মে

১.নীচের শব্দগুলিকে পদে রূপান্তরিত করে অর্থপূর্ণ বাক্য বানাও :

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মদিন বিদ্যালয় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়।

১.২ আমি বাবা রোজ মাছ খাবার দেওয়া।

১.৩ বাড়ি লোক মাঠ চাষবাস করা।

১.৪ উনি তুমি নাম জানো চায়।

১.৫ দিদিমণি ক্লাস নেওয়া পর একটা গান শোনা।

২.নীচের বাক্যগুলি থেকে 'অ'-বিভক্তিযুক্ত ও অন্যান্য বিভক্তিযুক্ত পদ নির্দেশ করো :

২.১ অনেক রাত পর্যন্ত বই পড়ে ঘুমোতে যাই।

২.২ নদীগুলি সমুদ্রের কাছে এসে বেগ কম করে।

২.৩ প্রশ্নপত্র কঠিন বলে কারো আর কলম চলছে না।

২.৪ হানিফ মিয়া কাস্তে হাতে ধান কাটতে গেল।

২.৫ কলকাতায় দাদার বাড়িতে যাবে বলে মছলন্দপুর থেকে ট্রেন ধরল।

৩.নীচের এক একটি শব্দে বিভিন্ন শব্দবিভক্তি যুক্ত করে নতুন শব্দরূপ বানাও :

আমি, আপনি, তুই, সে, উনি, তুমি, ও, তিনি

৪.নীচের শব্দবিভক্তিগুলির প্রতিটির আগে তিনটি করে উপযুক্ত শব্দ জুড়ে পদ বানাও :

গুলো, দের, এরা, দিগ, গণ, রা, গুলি

৫.নীচের শব্দগুলি থেকে শব্দ ও শব্দবিভক্তি আলাদা করো :

সন্তানদিগেরা, পাখিগুলি, প্রাণকে, আপনাদেরকে, শিশুগুলির, কলতলাতে, সন্ধ্যাবেলায়, ভূতেদের, নৃত্যটি, মানুষদের, ভয়কে

৬.নীচের অনুসর্গগুলির আগে উপযুক্ত অর্থপূর্ণ শব্দ বসাও :

পানে, কাছে, বাবদ, দিয়ে, দিকে, মধ্যে, জন্যে, ভিতরে, সঙ্গে, পাশে, ব্যতীত, ন্যায়, সমীপে, অভিমুখে, দ্বারা, কর্তৃক, বিনা, তরে, মাঝে, ছাড়া, সাথে, আগে, সুদ্ধ, বই, বদলে, বাবদ, দরুন, বনাম, বরাবর

৭.উপযুক্ত অনুসর্গ বসিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো :

৭.১ দৌড়ে সবার _____ প্রথম হলো।

৭.২ জুতো _____ খালিপায়ে যাবে কী করে?

৭.৩ বইগুলো _____ মোট তিনশো টাকা দিতে হলো।

৭.৪ সবাই সবার _____ যেতে চায়।

৭.৫ প্রতিবছরের _____ এবারেও মেলা বসেছে।

৭.৬ বাড়ি ফেরার সময় সকলের _____ ভালো মিষ্টি এনো।

৭.৭ আহা ছেলেমানুষ _____ তো নয়!

৭.৮ শিক্ষক _____ ছাত্রদের ক্রিকেট খেলা আছে।

৮ নীচের বাক্যগুলি থেকে বিভিন্ন শব্দের উপসর্গগুলিকে আলাদা করো :

৮.১ তিনি অনাহারে অনড় থাকায় স্বাস্থ্যের অত্যন্ত অবনতি হলো।

৮.২ কুকাজ করে বিপদে পড়ায় এখন সম্মান নিয়ে টানাটানি চলছে।

৮.৩ সুস্বাদু মাংস খেয়ে খোশমেজাজে বাড়িতেই অবস্থান করছেন।

৮.৪ বদহজম হলে হরেকরকম ওষুধ আছে, ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী খেয়ো।

৮.৫ অত্যাচার করে, উৎপীড়ন করে নির্দোষ লোকগুলিকে বিপদে ফেলছ।

৯. তিনটি করে উপসর্গযুক্ত শব্দ ব্যবহার করে আলাদা আলাদা পাঁচটি বাক্য বানাও ।

১০. নীচের শব্দগুলির আগে তিনটি করে উপসর্গ বসিয়ে আলাদা আলাদা শব্দ তৈরি করো :

নতি, চার, দেশ, পদ, কাশ

১১. বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি উপসর্গযুক্ত মোট তিনটি করে শব্দ জুড়ে আলাদা আলাদা পাঁচটি অর্থপূর্ণ বাক্য বানাও।

চতুর্থ অধ্যায়

ধাতুরূপ

ধাতুবিভক্তি/ক্রিয়াবিভক্তি ও ক্রিয়া

১. ধাতুরূপ

তোমাদের এখন একটু দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটা অংশ একটু মনে করতে হবে। সেখানে এক জায়গায় আমরা দেখেছিলাম **ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ জুড়ে সাধিত শব্দ** কীভাবে তৈরি হয়।

যে শব্দগুলি দিয়ে আমরা কোনো কাজ করা বা হওয়া বোঝাই সেগুলির নাম **ক্রিয়া**। এটাও আমরা জেনে গেছি আগেই। এবার সেরকম

কয়েকটা শব্দ নিই যেগুলি কাজ বোঝাচ্ছে। যেমন দেখো :

চলা, বলা, দেখা, শোনা, করা, খাওয়া, চাওয়া, হওয়া

এই শব্দগুলিকে (ক্রিয়া শব্দ) আরো ছোটো অংশে ভাঙা যায়। কারণ এগুলি শব্দাংশ বা সহযোগী শব্দখণ্ড জুড়ে তৈরি হয়েছে। আর তার সঙ্গে মূল অংশ হিসেবে বা সার অংশ হিসেবে যেগুলি আছে, সেগুলিই হলো **ধাতু** বা **ধাতুরূপ**। ক্রিয়া শব্দগুলির একটা মানে রয়েছে। কিন্তু এগুলিকে ভেঙে আমরা পাব **ধাতু** আর **প্রত্যয়** জাতীয় শব্দাংশ। সে দুটোর কোনোটাই কিন্তু অর্থপূর্ণ শব্দ নয়। ধাতুরূপ লেখার আগে সেটাকে চেনাবার জন্য আমরা '√' চিহ্ন বসাই, এটাও আগে জেনে গেছি।

ক্রিয়া	ধাতু	সহযোগী শব্দখণ্ড
চলা	√ চল্	আ
বলা	√ বল্	আ
দেখা	√ দেখ্	আ
শোনা	√ শুন্	আ
করা	√ কর্	আ
খাওয়া	√ খা	আ (ওয়া হচ্ছে)
চাওয়া	√ চা	আ (ওয়া হচ্ছে)
হওয়া	√ হ	আ (ওয়া হচ্ছে)

√ চল্ + আ = চলা — এইভাবে তাহলে **ধাতুরূপ + সহযোগী শব্দখণ্ড = ক্রিয়া** তৈরি করছে।

‘আ’ নামের এই অংশটা ধাতুরূপের পরে শব্দাংশ হিসেবে জোড়ে বলে, এটাকে **ধাতুসহযোগী শব্দখণ্ড** বলে। কোনো কোনো ক্রিয়াশব্দে দেখ ‘আ’-টা উচ্চারণে ‘ওয়া’ হয়ে যাচ্ছে। যেমন :

√হ্ + আ = হআ/হয়া না হয়ে **হওয়া** হচ্ছে। আবার দেখো ক্রিয়া শব্দটাতে ধাতুরূপটারও উচ্চারণ বদলে যেতে পারে। যেমন : √বুঝ্ + আ = বুঝা না হয়ে বোঝা, √শুন্ + আ = শুনা না হয়ে শোনা ইত্যাদি।

এমন আরও কিছু সহযোগী শব্দাংশ রয়েছে যেগুলি ধাতুর পরে যুক্ত হয়ে ক্রিয়াশব্দ তৈরি করে না। শব্দগুলি অন্য ধরনের শব্দ হয়ে যায়। এরকম কয়েকটা হলো :

- অন	√ চল্ + অন = চলন, √ শী + অন = শয়ন নয়ন, গমন, বরণ, হরণ ইত্যাদি।
-মান	√ চল্ + মান = চলমান, √ বহ্ + মান = বহমান ধাবমান, দৃশ্যমান, বিদ্যমান ইত্যাদি।
-আই	√ সিল্ + আই = সেলাই, √ লড়্ + আই = লড়াই বাছাই, চড়াই, খাড়াই, খোদাই, যাচাই ইত্যাদি।
-অক	√ পঠ্ + অক = পাঠক, √ দৃশ্ + অক = দর্শক গায়ক, নায়ক, বাদক, নর্তক ইত্যাদি।
-ইয়ে	√ খা + ইয়ে = খাইয়ে, √ বল্ + ইয়ে = বলিয়ে করিয়ে, নাচিয়ে, গাইয়ে, বাজিয়ে ইত্যাদি।

এই উদাহরণগুলি মনে রাখব শুধু এইটুকু বুঝতে যে, ধাতুরূপ আর শব্দাংশ জুড়ে কেবল ক্রিয়াশব্দই তৈরি হয় না। অন্য ধরনের বিভিন্ন শব্দও তৈরি হয়। এর উলটো টাও হয়। অর্থাৎ ক্রিয়াশব্দ তৈরি করতে কেবল ধাতুরূপ লাগে এমনটাও নয়। এমন অনেক শব্দরূপ আছে যেগুলি থেকে তৈরি হওয়া শব্দ আমরা কোনো কাজ বোঝাতে ক্রিয়াশব্দ হিসেবেই ব্যবহার করে থাকি। যেমন :

(অবস্থা) ঘুম - ঘুমোবেন (ক্রিয়া)

(বস্তু) ধ্বনি - ধ্বনিল (ক্রিয়া)

(বস্তু) বিষ - বিষাইছে (ক্রিয়া)

(অবস্থা) কাতর - কাতরানি (ক্রিয়া)

(বৈশিষ্ট্য) রাঙা - রাঙানো (ক্রিয়া)

(ধ্বনি) খটখট - খটখটিয়ে (ক্রিয়া)

(ধ্বনি) ভ্যানভ্যান - ভ্যানভ্যানানি (ক্রিয়া)

(বৈশিষ্ট্য) পচা - পচানো, পচাচ্ছে (ক্রিয়া)

এবার আমরা আবার ফিরে যাই ওই -আ শব্দখণ্ড ধাতুর শেষে বসিয়ে তৈরি হওয়া ক্রিয়াশব্দগুলিতে। ওই ক্রিয়াশব্দগুলি ছিল : চলা, দেখা, হওয়া ইত্যাদি।

বাক্যে এগুলিকে আমরা ব্যবহার করি। তোমার সঙ্গে আবার **দেখা** হলো। এইভাবে **চলা** অসম্ভব। এবার একটু গান **হওয়া** উচিত।

প্রত্যয় বসিয়ে তৈরি এই ক্রিয়াশব্দগুলি শুধু কিছু মূল কাজ বোঝাচ্ছে। কিন্তু এগুলি দিয়ে সবসময় বাক্য তৈরি করা চলে না। অন্য কয়েকটা বাক্য দেখলেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। যেমন ধরো :

আমি **দেখাব**।

ভদ্রলোক **দেখালেন**।

এমন জিনিস **দেখানো** অসম্ভব।

দেখাতে হলে ভালোটাই **দেখাও**।

√দেখ ধাতু থেকে যেমন শেষে -আ শব্দাংশ বসিয়ে একটা ক্রিয়াশব্দ 'দেখা' হয়েছিল, এবার সেই 'দেখা' শব্দটার পরেও আবার -ব, -লেন, -নো, -তে, -ও জাতীয় শব্দাংশ বসিয়ে আরো অনেকগুলি ক্রিয়াশব্দ তৈরি হয়ে গেল। তাহলে √দেখ্ শব্দাংশটা যেমন একটা মূল হিসেবে কাজ করছিল, তেমন এবার 'দেখা' ক্রিয়াশব্দটাও আরেকটা মূল হিসেবে কাজ করছে। সেখান থেকে একই উপায়ে অর্থাৎ পরে নতুন শব্দাংশ জুড়ে আরো অনেকগুলি ক্রিয়াশব্দ তৈরি করে ফেলতে পারছি। তাহলে 'দেখা'-টাকেও আমরা আরেক ধরনের মূল বলতে পারি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শিখেছিলাম মৌলিক/সিদ্ধ শব্দ একরকম, আর সাধিত/যৌগিক শব্দ আরেকরকম। মৌলিক শব্দগুলিকে আর ভাঙা যায় না, কিন্তু সাধিত শব্দগুলিকে ভাঙা যায়। ক্রিয়াশব্দের যে মূলগুলি সবথেকে ছোটো, এবার থেকে সেগুলিকে বলব **মৌলিক ধাতু** বা **সিদ্ধ ধাতু**। সেগুলির সঙ্গে -আ প্রত্যয় জুড়ে যে ক্রিয়াশব্দগুলি তৈরি হলো সেগুলিকে বলব যৌগিক ধাতু বা সাধিত ধাতু। কারণ এই শব্দগুলোও কাজ করা বা হওয়া বোঝায়। আবার এই শব্দগুলি অন্য কতগুলি বড়ো ক্রিয়াশব্দের মূলরূপ হিসেবে কাজ করতে পারে বলে এগুলিকে ধাতু বলেই ধরা হয়। মৌলিক ধাতুর সঙ্গে যেমন শব্দাংশ যুক্ত হয়, তেমনি সাধিত ধাতুর সঙ্গে যে শব্দাংশ যুক্ত হয় সেগুলিকে বলে বিভক্তি। এই বিভক্তিগুলির নাম **ধাতুবিভক্তি**। এর

কথা আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে একটু জেনেছিলাম। এবার আরো ভালো করে জানব।

যতটা জানলাম তাকে এবার এইভাবে সাজিয়ে নিতে পারি :

সিদ্ধ ধাতু + শব্দাংশ = সাধিত ধাতু

সাধিত ধাতু + ধাতুবিভক্তি = ক্রিয়াপদ

উদাহরণ দেখে নিই :

সিদ্ধধাতু	শব্দাংশ	সাধিত ধাতু	ধাতুবিভক্তি	ক্রিয়া
√ ভাব্	-আ	ভাবা	-নো	ভাবানো
√ বস্	-আ	বসা	-নো	বসানো
√ কর্	-আ	করা	-লেন	করালেন
√ শেখ্	-আ	শেখা	-ন	শেখান
√ দে	-আ	দেওয়া	-ই	দেওয়াই
√ খা	-আ	খাওয়া	-য়	খাওয়ায়

এর পাশাপাশি মনে রাখব যে, মৌলিক/সিদ্ধ ধাতুর সঙ্গে শব্দাংশ না জুড়ে সরাসরি ধাতুবিভক্তি বা ক্রিয়াবিভক্তিগুলি জুড়েও ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। যেমন :

√বল্ + ত = বলত; √কর্ + ই = করি;

√চল্ + ও = চলো; √দেখ্ + ই = দেখি,

√দে + য় = দেয় (দ্যায়); √খা + ন = খান;

√বুঝ্ + এ = বোঝে

ধাতুরূপ একটা কাজের মূল ধারণাটাকে বোঝায়। কিন্তু ক্রিয়াপদগুলিকে দেখলেই আমরা আরো কতগুলি জিনিস বুঝতে পারি। যেমন : কাজটা কেউ নিজে করছে না অন্যকে দিয়ে করাচ্ছে। কাজটা সে নিজের জন্য করছে না অন্যের জন্য করছে। কেবল কাজটার পরিচয়

দেওয়া হচ্ছে, নাকি কাজটা করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বা কাজ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। কাজটা আগেই হয়ে গেছে, নাকি এখন কাজটা চলছে, নাকি পরে কখনো কাজটা করা হবে। তাহলেই ভেবে দেখো ক্রিয়াপদের কতরকম বৈশিষ্ট্য হয়। সিদ্ধধাতু বা সাধিত ধাতুর সঙ্গে যে ক্রিয়াবিভক্তি/ধাতুবিভক্তিগুলি জুড়ে যায় সেগুলির কাজই হচ্ছে ক্রিয়াপদের এই বৈশিষ্ট্যগুলি বুঝিয়ে দেওয়া। কয়েকটা বাক্যের সাহায্যে এই ক্রিয়াপদের পার্থক্য বুঝে নিই :

১) আমি গান **শুনি**। ২) আমরা গান **শুনি**।	**শুনি**

'আমি' বা 'আমরা' দুবারই দেখো ক্রিয়াপদটা একই থাকছে — 'শুনি'। কিন্তু এটাই যখন 'তুমি',

‘তোমরা’, ‘সে’, ‘তারা’ শব্দগুলির সঙ্গে বসবে তখন অন্যরকম হয়ে যাবে।

৩)তুমি গান **শোনো**। ৪) তোমরা গান **শোনো**।	**শোনো**
৫) আপনি গান **শোনেন**। ৬) আপনারা গান **শোনেন**।	**শোনেন**
৭) তুই গান **শুনিস**। ৮) তোরা গান **শুনিস**।	**শুনিস**

তুমি বলে যেমন বলি, তেমনি গুরুজন হলে বা অচেনা লোক হলে তাকে আপনি বলি। সমবয়সি বা ছোটো হলে তুই বলে ডাকি। সেইভাবে [তুমি-তোমরা], [আপনি-আপনারা] আর [তুই-তোরা] — এগুলির প্রতিটি জোড়ার জন্য

একই রকম ক্রিয়াপদ বসে। এরকমই আরো কয়েকটির দৃষ্টান্ত হলো :

৯) ও/সে গান **শোনে**। ১০) ওরা/তারা গান **শোনে**। ১১) পরিমল গান **শোনে**। ১২) পরিমলরা গান **শোনে**।	**শোনে**
১৩) উনি/তিনি গান **শোনেন**। ১৪) ওরা/তারা/ওনারা/ তেনারা গান **শোনেন**।	**শোনেন**

১ আর ২ কে বলব **আমি পক্ষ**। ৩ থেকে ৮ কে বলব **তুমি পক্ষ**। ৯ থেকে ১৪ কে বলব **সে পক্ষ**। প্রত্যেক পক্ষেই একজন বোঝাচ্ছে এমন শব্দ আছে, আবার একের বেশি জন বোঝাচ্ছে এমন শব্দও আছে। নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ যে, ৫-৬ আর ১৩-১৪ এই দুটো জোড়ার

মানুষগুলি আলাদা হলেও ক্রিয়াপদগুলি একই (শোনেন) থাকছে।

যে কোনো মানুষ বা মানুষদের যখন এই সব শব্দগুলি দিয়েই পরিচয় দিই বা চিনি, তখন একটাই ধাতু বা ক্রিয়াপদ নানা বিভক্তি জুড়ে নানারকম হয়ে যায়। এরকম মোট পাঁচটা রূপ পেলাম।

√ শুন্ + ই = শুনি	আমি পক্ষ
√ শুন্ + ও = শোনো	তুমি পক্ষ
√ শুন্ + ইস = শুনিস	তুমি পক্ষ
√ শুন্ + এ = শোনে	সে পক্ষ
√ শুন্ + এন = শোনেন	তুমি পক্ষ + সে পক্ষ

কাজটা/কাজগুলো কে বা কারা করছে সেই অনুযায়ী এখানে মৌলিক/সিদ্ধ ধাতু অথবা

যৌগিক সাধিত ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি জুড়ে (ই, ও, এস, এ, এন) ক্রিয়াপদগুলি তৈরি হচ্ছে। এরপর আমরা অন্য আরেক ধরনের ক্রিয়াপদ চিনে নেব। একটা কাজ হলে বা করলে সময় অনুযায়ী তার তিনরকম পরিচয় থাকতে পারে। হয় কাজটা আগে করা হয়ে গেছে। না হলে কাজটা এখন করা হচ্ছে। অথবা কাজটা পরে করা হবে।

যেটা হয়ে গেছে সেটা **অতীত সময়/কাল**

যেটা এখন হচ্ছে সেটা **বর্তমান সময়/কাল**

যেটা পরে করা হবে সেটা **ভবিষ্যৎ সময়/কাল**

সে সব কাজ অতীত সময়ে করা হয়ে গেছে বা করা হচ্ছিল

করলেন, যাচ্ছিলাম, লিখছিলেন, যেতাম, পড়তেন, দেখাচ্ছিলেন, ভাবত

যে সব কাজ বর্তমান সময়ে করা হচ্ছে

গাইছে, বসেছেন, ওঠে, ঘোরে, পড়ছে, দেখেছে

যে সব কাজ ভবিষ্যৎ সময়ে করা হবে

বলবেন, যাবি, থাকবেন, এসে থাকবে, ভুলব

এবার তাহলে দেখলাম যে, কাজটা কখন করা হচ্ছে সেই অনুযায়ী এখানে মৌলিক অথবা সাধিত ধাতুর সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি জুড়ে ক্রিয়াপদগুলি তৈরি হচ্ছে। আগের তালিকা আর এই তালিকা দুটো একসঙ্গে আসলে কাজ করা বোঝায়। এবারে তাই দুটোকে মিলিয়ে লিখব।

ব্যক্তি পক্ষ	অতীত কাল	বর্তমান কাল	ভবিষ্যৎ কাল
আমি - আমরা	বলেছিলাম,	বলছি, যাই যেতাম	বলব, যাব
তুমি - তোমরা	বলেছিলে, যেতে	বলছ, যাও	বলবে, যাবে *
তুই - তোরা	বলেছিলি, গিয়েছিলি	বলছিস, যা	বলবি, যাবি
ও / সে - ওরা / তারা সাকিলা-সাকিলারা	বলেছিল, যেত	বলছে, যাক	বলবে, যাবে *
উনি/তিনি-ওনারা/ তাঁরা আপনি-আপনারা	বলেছিলেন, যেতেন	বলছেন, যান	বলবেন, যাবেন

* চিহ্নিত অংশদুটোর মধ্যে মিল রয়েছে। তার মানে 'তুমি' পক্ষের আর 'সে' পক্ষের ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদগুলি একই রকম হয়।

ক্রিয়াপদগুলি বাক্যের মধ্যে কাজের পদ্ধতি বা গতিপ্রকৃতিকে নানারকম ভাবে বোঝায়। সেই অনুযায়ী কয়েক রকমের ক্রিয়াপদের পরিচয় এবার দেখে নেব।

১. **বাক্যের যে ক্রিয়াপদ সেই কাজটা সম্পূর্ণ হয়েছে এটা বোঝায় তার নাম সমাপিকা ক্রিয়া**। যেমন :

ট্রেনটা স্টেশনে **পৌঁছল**। আমরা পেটভরে **খেলাম**। বইগুলো গুছিয়ে **রাখল**।

২. **বাক্যের যে ক্রিয়াপদে কাজটা সম্পূর্ণ হওয়া বোঝায় না তাকে অসমাপিকা ক্রিয়া বলে।**

শুধু অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে বাক্যে তৈরি হয় না। তার শেষে সমাপিকা ক্রিয়া বসে। যেমন :

কান **টানলে** মাথা আসে। বইটা **পড়ে** ফেরত দিয়ো। স্নান **করে** ভাত খাব।

৩.**একটার বেশি ক্রিয়াপদ যখন জুড়ে গিয়ে একটাই কাজ বোঝায় এবং এর প্রথমটি অসমাপিকা ও পরেরটি সমাপিকা ক্রিয়া হয় তখন তার নাম যৌগিক ক্রিয়া।** যেমন :

ঘুম থেকে **উঠে পড়ো**। লুকিয়ে সব রসগোল্লা **খেয়ে ফেলল**। দূর থেকে **দেখতে পেলাম**।

৪.**একটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে যদি কোনো বৈশিষ্ট্যবাচক বা নামবাচক শব্দ জুড়ে একসঙ্গে একটি কাজই বোঝায় তখন**

সেগুলিকে সংযোগমূলক ক্রিয়া বলে। যেমন :

প্রশ্ন **জিজ্ঞাসা করুন**। নদী **বয়ে চলে**। একটু কাজে **হাত লাগাও**।

৫. **কোনো কোনো ক্রিয়াপদে ব্যক্তি নিজে কাজটা করছে বা ঘটছে না বুঝিয়ে অপর কাউকে দিয়ে করানো বা ঘটানো যখন বোঝায় তখন সেগুলিকে প্রযোজক ক্রিয়া বলে।** যেমন : লোক লাগিয়ে ময়লা সাফাই **করাচ্ছেন**। তোমায় এবার অঙ্ক **করাব**।

৬. **ক্রিয়াপদটিকে 'কী করে?' প্রশ্ন করে যদি বাক্যের কোনো শব্দে তার উত্তর পাওয়া যায় (অর্থাৎ যে ক্রিয়ার কর্ম রয়েছে) তাহলে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে।** যেমন :

রোজ সে দেরি করে বাড়ি **ফেরে**। এতদিনে সে ভালো রাঁধতে **শিখেছে**। রাগ করে তিনি আর কবিতা **পড়লেন না**।

৭. **যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে কোনো কর্মবাচক শব্দ নেই তাকে অকর্মক ক্রিয়া বলে। এই ধরনের ক্রিয়া কেবল বাক্যের ঘটনা বা কাজটুকুই বোঝায়।** যেমন :

সে শুধু **দেখে**। সে হঠাৎ **বলে ফেলল**। আপনি কী **ভাবছেন**?

হাতে কলমে

১. নীচের শব্দাংশগুলির আগে উপযুক্ত ধাতুরূপ বসিয়ে শব্দ তৈরি করো।

শব্দগুলি দিয়ে একটি করে বাক্য বানাও :

-অন, -মান, -আই, -অক, -ইয়ে, -আ, -ওয়া

২. নীচের ধাতুগুলি থেকে বিভিন্ন ক্রিয়াপদ তৈরি করো :

√বল, √কর, √দেখ, √চল, √পড়, √বস, √খা, √দে, √পা, √গুন

৩. সিদ্ধধাতু + শব্দাংশ + ধাতুবিভক্তি — এই তিনটি উপাদান জুড়ে পাঁচটি আলাদা ক্রিয়াপদ তৈরি করো।

৪. আমি/আমরা পক্ষ, তুমি/তোমরা পক্ষ, সে/তারা পক্ষ তিনটির ক্ষেত্রে নীচের ক্রিয়াপদগুলির বিভিন্ন চেহারা কেমন হবে দেখাও :

করা, শোয়া, গাওয়া, বলা, ভাবা

৫. নীচের ক্রিয়াপদগুলির অতীত কালের রূপ দেখাও :

লেখা, পড়া, শোনা (আমি, তুমি, সে - তিনটি পক্ষে)

৬. নীচের ক্রিয়াপদগুলির বর্তমান কালের রূপ দেখাও :

পারা, দেওয়া, দেখা (আমি, তুমি, সে — তিনটি পক্ষে)

৭. নীচের ক্রিয়াপদগুলির ভবিষ্যৎ কালের রূপ দেখাও :

চলা, থাকা, খেলা (আমি, তুমি, সে — তিনটি পক্ষে)

৮. সমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

৯. পাঁচটি বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার দেখাও।

১০. যৌগিক ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

১১. সংযোগমূলক ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

১২. প্রযোজক ক্রিয়া ব্যবহার করে পাঁচটি বাক্য তৈরি করো।

পঞ্চম অধ্যায়

শব্দযোগে বাক্যগঠন

পরস্পর অর্থের সম্পর্কযুক্ত পদগুলি জুড়ে নির্দিষ্ট ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে যখন কোনো বক্তব্য, ধারণা বা ভাবনাকে প্রকাশ করে— সেই এককগুলিকে বলব বাক্য।

কিন্তু কথা বলার সময় একটা পদ দিয়েও বাক্যের কাজ করা হয়। যেমন :

জামাল : তুই যাবি না?

পলাশ : না।

জামাল : কেন?

পলাশ : ধুর্। গিয়ে কী করব?

জামাল : তবে?

পলাশ : তবে তুই একাই যা।

দেখো এই কথোপকথনে 'না' 'কেন', 'ধুর্', 'তবে'— চারটে শব্দ এক একটা বাক্যের মতো কাজ করছে। তাহলে একটা শব্দ দিয়েও বাক্য তৈরি হতে পারে। এগুলিকে কেউ কেউ **শব্দবাক্য** নামে চেনে। অন্যমতে এগুলো হলো আকারহীন বাক্য বা ছদ্মবাক্য। ইংরেজিতে এর একটা নাম আছে amorphous sentence. কিন্তু এগুলির মধ্যেও দেখো পুরো পুরো বাক্য লুকিয়ে ছিল। বলার সময় জামাল বা পলাশ কেটে ছোটো করে নিয়েছে। এবার পুরোটাই নতুন করে দ্যাখো :

জামাল : তুই যাবি না?

পলাশ : না, যাব না।

জামাল : কেন যাবি না?

পলাশ : ধুর্, ইচ্ছে করছে না। গিয়ে কী করব?

জামাল : তবে আমি কী করি?

পলাশ : তবে তুই একাই যা।

আসলে কিন্তু ভেতরে ভেতরে নিয়ম মেনেই বাক্য তৈরি হয়েছিল। বলার সময় ছোটো করে নিতেও অর্থের ক্ষতি হয়নি। তাহলে একই বাক্যে পদ বাড়িয়ে বাক্যটাকে বড়ো করা যায়, আবার বড়ো বাক্যগুলোকে পদ কমিয়ে ছোটো বাক্যও করে ফেলা যায়। ব্যাপারটা অনেকটা বেলুনের মতো। হাওয়া দিলে ফুলে বড়ো হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ফোলানো বেলুনের হাওয়া বের করে দিলেই ব্যস— চুপসে এই এতটুকুন! এরকম একটা ছোট্ট বাক্যকে কেমন ফুলিয়ে বড়ো করি দেখো:

ছেলেটা যায়। (দুটো পদ)

গোয়ালা ছেলেটা রোজ যায়। (চারটে পদ)

বেঁটেখাটো গোয়ালা ছেলেটা রোজ দুধ দিতে যায়। (আটটা পদ)

হালকা নীল রঙের জামা পরা বেঁটেখাটো গোয়ালা ছেলেটা রোজ দুবেলা সাইকেল চড়ে দুধ দিতে যায়। (ষোলোটা পদ)

দুই > চার > আট > ষোলো— এক এক ধাপে দ্বিগুণ করে করে বেলুনটা ফুলেছে।

এবার উলটো দিক থেকে দেখি। মানে বেলুনটা থেকে হাওয়া কমিয়ে কমিয়ে ছোট্ট করি।

শক্তিশালী কুস্তিগীর পালোয়ান রোজ চব্বিশটা করে ডিম খায়। (আটটা পদ)

কুস্তিগীর পালোয়ান রোজ ডিম খায়। (পাঁচটা পদ)

পালোয়ান খায়। (দুটো পদ)

ছোটো থেকে বড়োই হোক আর বড়ো থেকে ছোটো--- সব বাক্যগুলিকেই দ্যাখো দুটুকরো করা যাচ্ছে উদ্দেশ্য আর বিধেয় অংশে :

(বামপক্ষ) উদ্দেশ্য	বিধেয় (ডানপক্ষ)
ছেলেটা	যায়
গোয়ালা ছেলেটা	রোজ যায়
বেঁটেখাটো গোয়ালা ছেলেটা	রোজ দুধ দিতে যায়
হালকা নীল রঙের জামা পরা বেঁটে খাটো গোয়ালা ছেলেটা	রোজ দুবেলা সাইকেল চড়ে দুধ দিতে যায়
শক্তিশালী কুস্তিগীর পালোয়ান	রোজ চব্বিশটা করে ডিম খায়
কুস্তিগীর পালোয়ান	রোজ ডিম খায়
পালোয়ান	খায়

এবার বাক্যের গঠনটাকে দেখাতে পারি এভাবে :

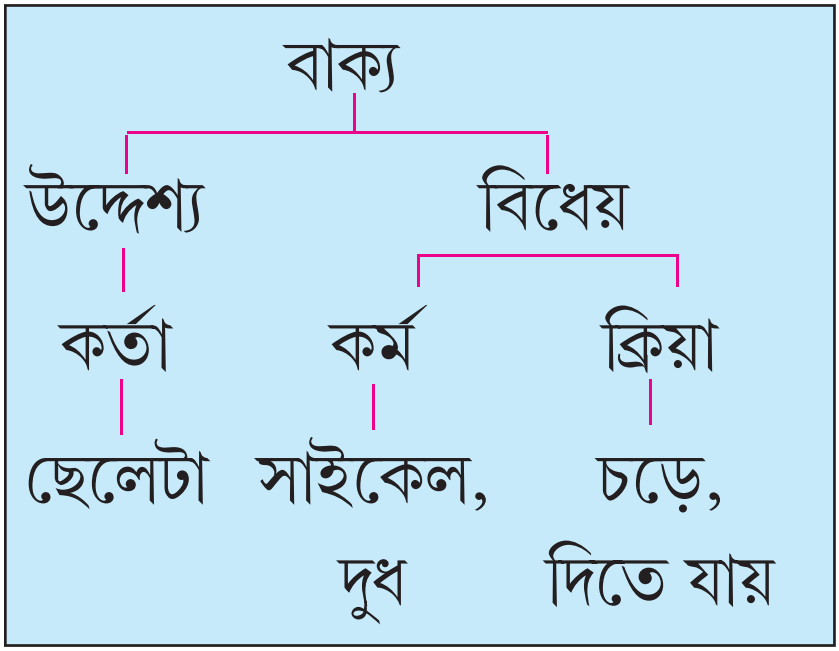

এখন আমরা পুরো বাক্যটার একটা চেহারা সাজিয়ে নেব :

উদ্দেশ্য অংশ			
কর্তার প্রসারক	ক্রিয়া	কর্তার প্রসারক	কর্তা
হালকা নীল রঙের জামা	পরা	বেঁটেখাটো গোয়ালা	ছেলেটা

বিধেয় অংশ				
সময় বাচক	কর্ম১	ক্রিয়া ১	কর্ম ২	ক্রিয়া ২
রোজ দুবেলা	সাইকেল	চড়ে	দুধ	দিতে যায়।

গঠন অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদ : সরল, যৌগিক ও জটিল বাক্য

বেলুন ফোলানো আর বেলুনের হাওয়া বের করার কথাটা মনে আছে তো? একটা ছোটো বাক্যকে কেমন ফুলিয়েফাঁপিয়ে বড়ো করা যায় আবার বড়ো বাক্যের অনেক উপাদান বেরিয়ে গিয়ে কেমন চুপসে ছোটো হয়ে যায়। বাক্যের আকার বা গঠনের আরও নানান বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এবার সেগুলির বিষয়ে জানব।

অধ্যায়ের মধ্যে যেসব বাক্য উদাহরণ হিসেবে দেখেছি--- গঠনগত দিক থেকে সেগুলোর

সবকটিই **সরলবাক্য**। গঠনের দিক থেকে আরও দুরকম বাক্য হয়। একটার নাম **যৌগিক বাক্য**, আর একটার নাম **জটিল বাক্য**। এই তিনটি প্রধান রূপভেদ ছাড়াও আরেকটি রয়েছে — সেটার নাম **মিশ্রবাক্য** (এটা অবশ্য আগের তিনটের মতো নির্দিষ্ট একটি গঠনের নিয়ম মেনে তৈরি নয়।)

সরলবাক্য

বাক্যের গঠনগত বৈশিষ্ট্য দেখতে গিয়ে এতক্ষণ যা যা চিনেছি আর দেখেছি তার প্রায় সবটাই সরলবাক্যের নিয়মের মধ্যে পড়ে। এবার সেগুলিকে বৈশিষ্ট্যের মতো সাজিয়ে নেব :

(ক) বাক্যগুলি একটাই সমাপিকা ক্রিয়া নিয়ে গঠিত হয়।

(খ) বাক্যগুলিতে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। থাকলে

একটির বেশি অসমাপিকা ক্রিয়াও থাকতে পারে।

(গ) বাক্যগুলি অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে।

(ঘ) বাক্যগুলিতে কখনও কর্তা অংশ ঊহ্য বা গোপন থাকে, আবার কখনও বা সমাপিকা ক্রিয়াও অনুক্ত থাকে।

এগুলি থেকেই পেয়ে যাব **তিন ধরনের** সরলবাক্য :

(১) কর্তাযুক্ত ক্রিয়াযুক্ত সরলবাক্য

কর্তার সঙ্গে একটা সমাপিকা ক্রিয়াসহ এই সরল বাক্যগুলি যেমন তৈরি হবে, তেমনি এক বা একের বেশি অসমাপিকা ক্রিয়াও তার সঙ্গে জুড়ে বসতে পারে।

(ক) তুমি দাও [কর্তা + সমাপিকা ক্রিয়া]

(খ) তুমি মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + গৌণকর্ম + মুখ্যকর্ম + ক্রিয়া]

(গ) তুমি আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + সময়বাচক + গৌণকর্ম + ...]

(ঘ) তুমি এই মঞ্চে আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + স্থানবাচক + ...]

(ঙ) তুমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও [কর্তা + স্থানবাচক + অসমাপিকা ক্রিয়া + ...]

(চ) তুমি এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে অন্ধদের জন্য ওর কাজের কথা সকলকে জানিয়ে আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও। [কর্তা + স্থানবাচক + অসমাপিকা ক্রিয়া + অসমাপিকা বাক্যখণ্ড + ...]

শেষ বাক্যটার পরিচয় দিতে গিয়ে একটা নতুন জিনিস বলা হলো— **অসমাপিকা বাক্যখণ্ড**।

নতুন জিনিস বলব না কারণ ব্যাপারটা আমরা আগেও দেখেছি। তাই বলব নতুন নাম। দ্যাখো (চ)-এর সরলবাক্যটাকে তিনটে সরলবাক্য বানিয়ে ছোটো ছোটো করব—

চ. (১) তুমি এই মঞ্চে দাঁড়াও।

চ. (২) তুমি অন্ধদের জন্য মুকুলিকার কাজের কথা সকলকে জানাও।

চ. (৩) তুমি আজ মুকুলিকার কাজের কথা সকলকে জানাও।

চ. (৪) তুমি আজ মুকুলিকাকে উপহারটা দাও।

এই তিনটেই দেখে নাও কর্তাযুক্ত + সমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত সরলবাক্য। কিন্তু (চ)-এর বাক্যটা কী

করেছে (চ.১) আর (চ.২)-এর শেষে সমাপিকা ক্রিয়াগুলোকে (দাঁড়াও, জানাও) দুটো অসমাপিকা ক্রিয়া বানিয়ে নিয়েছে (দাঁড়িয়ে, জানিয়ে)। (চ.১) আর (চ.২) আসলে দুটো সরলবাক্যই, কিন্তু বড়ো (চ) বাক্যটাতে ঢুকে সেগুলি মূল বাক্যের ভেতর এক একটা টুকরো অংশ হয়ে গেছে। তারপর কাজটাও সম্পূর্ণ হচ্ছে না বলে এগুলি **অসমাপিকা বাক্যখণ্ড**। এগুলির কথা ভুলে যেয়ো না।

এবার আরও কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি। তোমাদের বুঝিয়ে দিতে হবে এগুলি কেন সরলবাক্য।

মাদল বেশ ভালো গান করে।

বারণ করলেও সুনীল কথা না শুনে শব্দবাজি ফাটাচ্ছিল।

এক রাজার বাড়ির জানালার পাশে টুনটুনি বাসা বাঁধল।

বলাই খুব গাছপালা নিয়ে মেতে থাকে।

অনেক দূর থেকে একটা বাঁশির সুর ভেসে আসছে।

(২) কর্তাযুক্ত ক্রিয়াহীন সরলবাক্য

কর্তা আর কর্তার সম্প্রসারক নানা অংশ এই বাক্যগুলিতে থাকলেও সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে কোনো ক্রিয়ার ব্যবহার থাকে না; ক্রিয়া অনুক্ত বা ঊহ্য থাকে।

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে।

এখানে 'আমরা সবাই (হলাম) রাজা' কথাটার ক্রিয়াপদ 'হলাম'-টা অনুক্ত আছে। এরকম আরও কিছু সরলবাক্য হলো :

তারা খুব উঁচু জাতের লোক।
গলদা চিংড়ি, কাতলা, ইলিশ মিলিয়ে
এলাহি আয়োজন!
অমল, বিমল, কমল আর ইন্দ্রজিৎ
সকলেই বেশ ভালো ছেলে।
কাহার পাড়ার পালকিগুলো বেশ রংচঙে।
পালোয়ানের ইয়া বড়ো বড়ো গোঁফের
ফাঁকে পাখির মতো কটা দাঁত!

এই বাক্যগুলির কর্তা খুঁজে দেখাও। তারপর দেখাও অনুক্ত ক্রিয়াগুলোকে।

(৩) কর্তাহীন ক্রিয়াযুক্ত সরল বাক্য

এই সরল বাক্যগুলিতে ক্রিয়াখণ্ড বা বিধেয় অংশটাই কেবল থাকে। কর্তা খণ্ড বা উদ্দেশ্য অংশ এখানে অনুক্ত থাকে; প্রত্যক্ষভাবে কর্তার উপস্থিতি থাকে না।

আর কতবার একই পড়া পড়ব?

নাক বরাবর সিধে চলে যেতে হবে।

রাত হলেই বেহালা বাজানো শুরু হয়।

গ্রীষ্মকালে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হয় একটু খাবারের আশায়।

পড়াশোনা করতে বসত।

এই পাঁচটা বাক্যের অনুক্ত কর্তাখণ্ডগুলির পাঁচটা উদাহরণ দেব :

প্রথম বাক্য : আমরা এই পাঁচজন ছাত্র

দ্বিতীয় বাক্য : আপনাকে

তৃতীয় বাক্য : অন্ধ ভিখিরিটির

চতুর্থ বাক্য : কলকাতা শহরের কুকুরগুলোকে

পঞ্চম বাক্য : ছেলেবেলায় বাবারা চার ভাইবোনে মিলে